দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

হৃদয়ের দীপশলাকা
বিভূতিভূষণের
'হীরা মাণিক জ্বলে'
— পৃঃ ১৫

পুজোর ক'দিন
বাংলাদেশে
— পৃঃ ২৫

৭২ বর্ষ, ৮ সংখ্যা।। ২৮ অক্টোবর ২০১৯।। ১০ কার্তিক - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

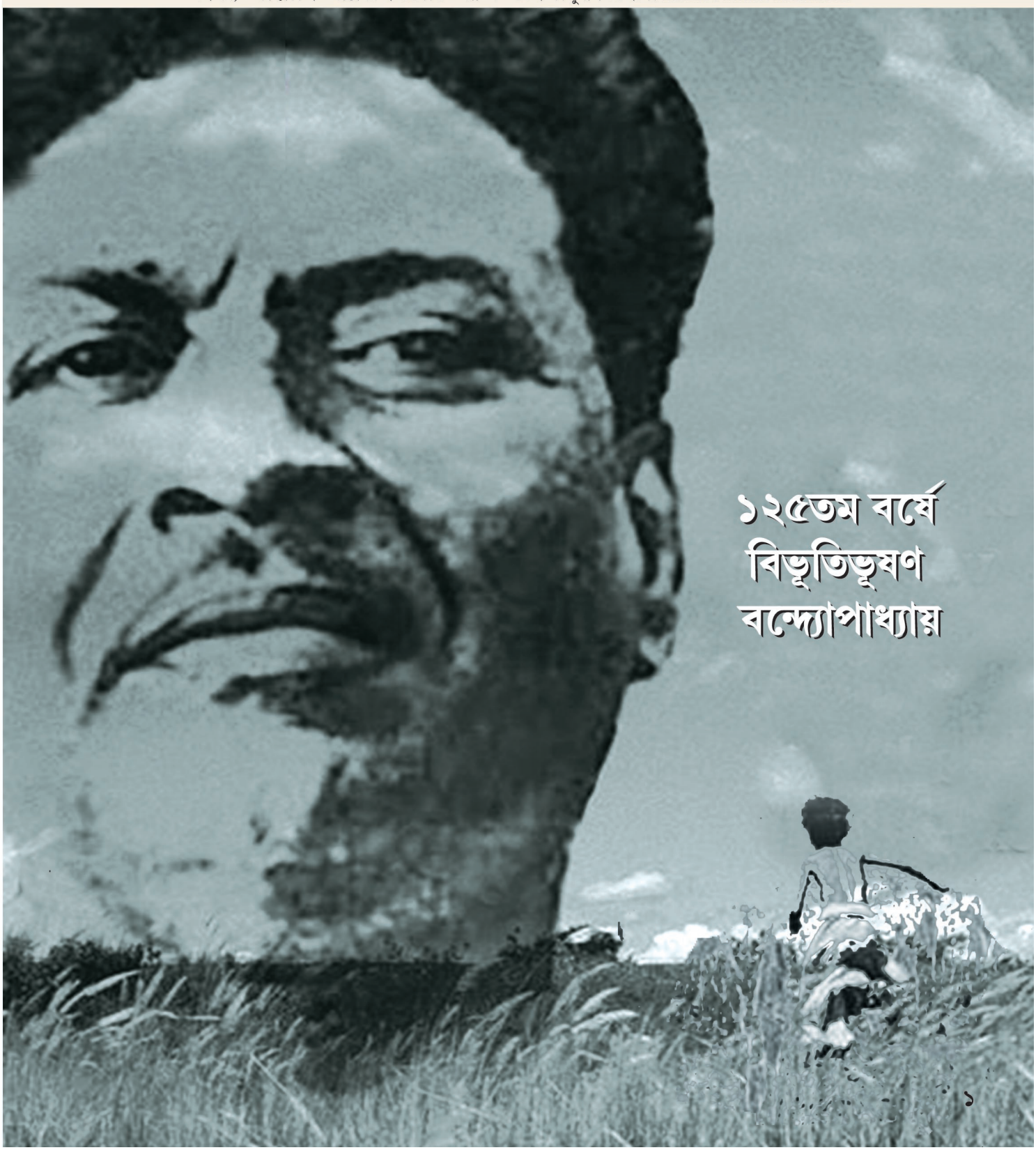

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ৮ সংখ্যা, ১০ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৮ অক্টোবর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

কমিউনিস্টদের পাকিস্তান প্রেমের সাক্ষী আবারও ভারত ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলাচিঠি : রাজ্যপাল ভুলে যাবেন না, এটা দিদির বাংলা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

ভারত শীঘ্রই পাঁচ ট্রিলিয়নের অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠছে ▯ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ▯ ৮

নোয়াখালির রক্তাক্ত দিনগুলি ▯ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ▯ ১১

মানুষ আর প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গম ▯ অভিজিত দাশগুপ্ত ▯ ১৩

হৃদয়ের দীপশলাকা বিভূতিভূষণের 'হীরা মানিক জ্বলে' ▯ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ▯ ১৫

আরণ্যকের সত্যবরণের মধ্যে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-জীবনের সন্ধান ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৭

আবরার হত্যাকাণ্ড জাতির জন্য লজ্জাজনক ▯ শিতাংশু গুহ ▯ ২৩

পুজোর ক'দিন বাংলাদেশে ▯ বিজয় আঢ্য ▯ ২৫

মালদহের জহুরা কালী ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ৩১

মদনলাল ধিংড়াকে অপমান করেছিলেন গান্ধীজী ▯ কৌশিক রায় ▯ ৩২

কেরলে বাম জমানায় হিন্দু নিধন ▯ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ▯ ৩৫

পঞ্জীকরণ না হলে হিন্দু বাঙ্গালিকে আবার উদ্বাস্তু হতে হবে ▯ আবীর গাঙ্গুলী ▯ ৩৭

অটোমোবাইল সেক্টরে মন্দা সাময়িক ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জী ▯ ৩৯

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালার প্রেক্ষিতে হিন্দুত্ব ▯ অত্রি মল্লিক ▯ ৪৩

'নোবেল পুরস্কার' না পেয়েও নোবেল প্রাপক হিসেবে প্রচার কেন? ▯ বরুণ মণ্ডল ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৭-৪৮ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৯ ▯ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
৪ নভেম্বর
২০১৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৪ নভেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে ভারতরত্ন খেতাব দেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মহারাষ্ট্রের রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে। আর তার ঠিক পরেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্য মাঠে নেমে পড়েছে কংগ্রেস-সহ বাম ও অতি-বাম রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু কীসের জন্য এই বিরোধিতা? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাভারকরের অবদানের মূল্যায়ন কি আমরা করতে পেরেছি? মূলত জরুরি অবস্থার পর থেকে বাম-উদারবাদী ঐতিহাসিকরা সাভারকরের বিরুদ্ধে লাগাতার কুৎসা রটিয়ে আসছেন। আজ অবধি আমরা এই কুৎসারও যুক্তিসংগত জবাব দিতে পারিনি। সাভারকর সম্পর্কিত সত্য থেকে গেছে অনুদ্ঘাটিত। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে সেই সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায়, বিমল শংকর নন্দ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জন্মের সওয়া শতবর্ষে বিভূতিভূষণ

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মের এবার সওয়া শতবর্ষ অর্থাৎ একশো পঁচিশ বৎসর (১৮৯৪-২০১৯)। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে তাঁহার মতো কথা-সাহিত্যিক বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষ খুব কমই লাভ করিয়াছে, শুধুমাত্র এই কারণেই তাঁহাকে স্মরণ করিবার তাৎপর্য নাই। ভারতবর্ষের সত্তার মধ্যে যে অখণ্ডতার রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আজিকার দিনে তাহার মূল্যও কম নহে। পরাধীন ভারতবর্ষকে তিনি দেখিয়াছেন, প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দেশের স্বাধীনতাও (বিভূতিভূষণের প্রয়াণ ১৯৫০)। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাহিরে ভারতবর্ষের যে একটি স্বতন্ত্র সত্তা ছিল, সুনির্দিষ্ট এক সংস্কৃতিক কাঠামো যে সত্তাটিকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল, বিভূতিভূষণ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পথের পাঁচালীর বালক অপু বনগ্রামের যে শোভা দর্শন করিয়াছিল, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভোগ করিয়াছিল, আরণ্যকের সত্যচরণ সুদূর ভাগলপুরে একই সম্পদের স্পর্শ অনুভব করিয়াছিল, উপলব্ধি করিয়াছিল; কেবল বয়সের পরিণত বোধ তাকে প্রকৃতির সঙ্গে মানবের মেলবন্ধনেও সহায়তা করিয়াছিল।

বস্তুত শাশ্বত ভারতের সনাতন বাণীকে তাঁহার গল্প উপন্যাসে যেভাবে মূর্ত করিয়াছেন বিভূতিভূষণ তাহার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান কালেও অতীব প্রাসঙ্গিক। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। শৈশবের দারিদ্র্য পরিণত বয়সের সংগ্রামের রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতেই ভারতবর্ষের সনাতন চেহারাটির চাক্ষুষ করিয়াছিলেন তিনি। যেখানে অল্পে সন্তুষ্ট মানবের চেহারাটিই কেবল সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না, অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ আর সারল্যের অভিসারও তাহার জীবনের ধন বলিয়া বিবেচিত হয়। গ্রামীণ মানুষ, জঙ্গলে বাসরত জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে উচ্চতর সাধনা তিনি পরিলক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার বহু উপন্যাসে গল্পে তাহা মূর্ত হইয়াছিল, তাঁহার 'উৎকর্ণ', 'স্মৃতির রেখা' প্রভৃতি দিনলিপিমূলক আত্মজৈবনিক রচনাতেও তাহার স্বীকৃতি রহিয়াছে।

গ্রাম-জীবনের সনাতন দর্শন প্রত্যক্ষ করিবার সুবাদেই তিনি অনুভব করিয়াছিলেন গোজাতির মূল্য। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন গ্রামীণ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ইহাদের অবদানই সর্বাধিক। কেবল রচনার মধ্যেই তাঁহার ভাবনাকে সীমায়িত করেন নাই বিভূতিভূষণ, সনাতন গোরক্ষয়িত্রী সভার প্রচারক হিসাবে পথে-প্রান্তরে চিরভ্রমী তিনি গোজাতি সংরক্ষণে অসামান্য ভূমিকা লইয়াছিলেন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তাহা শ্রদ্ধার সহিত স্মর্তব্য। বিভূতিভূষণ যখন এই পদক্ষেপ লইয়াছিলেন, তখন সম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ভারতবর্ষকে এতটা কলুষিত করে নাই। দেশভাগ, পাকিস্তান দাবিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু আজিকার মতো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রে শুধুমাত্র সংখ্যাগুরু জনসাধারণের আবেগকে আহত করিবার উদ্দেশে গোজাতি নিধনের যে মহাযজ্ঞ চলিয়াছে, কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে হাতিয়ার করিয়া গোরক্ষকদের প্রতি বিদ্বেষমূলক প্রচার যেভাবে ছড়ানো হইতেছে, ভারতীয় অখণ্ডতা, একতা; সাংস্কৃতিক ঐক্যের ওপর যেভাবে ক্রমাগত আঘাত করা হইতেছে তাহাতে গোরক্ষিত্রী সভার প্রচারক, দেশপ্রেমের উচ্চতম পরাকাষ্ঠার প্রদর্শক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৃদয় যে বিদীর্ণ হইত তাহা বলাই বাহুল্য। নিসর্গের প্রতি তাঁর মানসিক নৈকট্য যে বিশ্বপ্রকৃতিকেও একাত্ম করিতে প্রস্তুত তাঁহার রচিত 'চাঁদের পাহাড়' তাহার বিশুদ্ধ নমুনা।

কিশোর সাহিত্যকেও তিনি যথাযথ গুরুত্ব দিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন কৈশোরকাল মানসিক গঠনের নির্মিতি-পর্ব, দেশের সম্পদ তাহার উত্তরাধিকারীদের হাতে কতটা সুরক্ষিত থাকিবে এই বেলা তাহা বুঝিয়া লইবার সময়। বিশ্ব চেতনার অজুহাতে স্বদেশকে লাঞ্ছিত করিবার প্রয়াস স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষ দেখিয়াছে, বিভূতিভূষণের পথ অনুসরণ করিলে বিশ্বমানবের স্বদেশাত্মা স্পন্দিত হইতে পারিত। যেমন বিভূতিভূষণ তাঁর অন্তিমজীবন ঘাটশিলায় অতিবাহিত করিয়া স্বদেশের প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক সম্পদ আহরণে উদ্যোগী ছিলেন। কর্ম মানুষকে অমরত্ব প্রদান করে, বিভূতিভূষণ তাঁহার কর্মের ঔজ্জ্বল্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন। ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইল।

সুভাষিতম্

দুর্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈব বিশ্বাসকারণম্।
মধু তিষ্ঠিতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহলম্।।

দুষ্টব্যক্তি ও তোষামোদকারীকে কখনোই বিশ্বাস করা উচিত নয়, কেননা তাদের মুখে মধু বর্ষণ হলেও হৃদয় বিষে পরিপূর্ণ থাকে।

কমিউনিস্টদের পাকিস্তান প্রেমের সাক্ষী আবারও ভারত

সংঘর্ষবিরতি চুক্তি না মেনে গুলি চালিয়েছিল পাকিস্তান, দুই সেনা জওয়ান-সহ এক নাগরিকের মৃত্যু হয়। ভারত প্রত্যাঘাত করায় নিদেনপক্ষে জনা ২০ পাক সেনা ও জঙ্গি মারা যায়। কেউ অসভ্যতা করলে সর্বংসহা ভারতবর্ষ যাবতীয় দৌরাত্ম্য হাসিমুখে সহ্য করবে, সহিষ্ণুতার সেই দিনগুলি আজ ফুরিয়ে এসেছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের ব্যাপারে ভারতের জিরো টলারেন্স, বর্তমান জমানায় সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটায় কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু নেহরুর করস্পর্শে ভারতে যা হয় এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। ভারতীয় রাজনীতিতে যারা বিপন্ন প্রজাতি থেকে অবলুপ্ত প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই হরেক কিসিমের কমিউনিস্টরা, যাদের বর্তমান অস্তিত্ব কেবল সোশ্যাল মিডিয়াতেই তারা ওই ঘটনার পর হল্লা জুড়ে বলল— ভোট এলেই নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় মোদী-শাহের সরকার, যাতে ভোটে ফায়দা লুটতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়াতেই অবশ্য পাল্টা কটাক্ষ আছড়ে পড়েছে, কমিউনিস্টদের এমন হাবভাব যে ভারত পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত না করলে যেন মহারাষ্ট্র-হরিয়ানার ভোটে লাল-ঝড় উঠতো।

বিষয়টা এতটা লঘু ইয়ার্কিরও নয়। হরিয়ানা-মহারাষ্ট্রে ভোটের দিন অতি বাম নিয়ন্ত্রিত জইশ সমর্থক একটি বাংলা সংবাদপত্রে অর্থনীতি নাকি দেশপ্রেম, জনগণ কাকে বেছে নেবে এমনতরো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের পশ্চিমবঙ্গেই কেউ পুঁছলো না, তখন কোথায় মহারাষ্ট্র, আর কোথায়ই বা হরিয়ানা! আপনাদের মনে থাকতে পারে, মহারাষ্ট্রে কৃষক আন্দোলনের নামে মানুষকে খেপিয়ে তুলে সেই 'লাল ঝড়' তোলার একটা চেষ্টা হয়েছিল অনেক দিন আগে, যার প্রতীক ছিল ক্ষতবিক্ষত ফাটা পায়ের ছবি। যদিও বিগত লোকসভা নির্বাচনে সেই বিক্ষত পদাঘাতেই মহারাষ্ট্রে অপাংক্তেয় বামপন্থীদের রাজনৈতিক সংরক্ষক কংগ্রেস ধরাশায়ী হয়েছিল, জনগণের রায়ের সুবাদে। আসলে সমস্যার জায়গাটা আমাদের বোঝা দরকার।

সারা বিশ্ব এই মুহূর্তে অর্থনৈতিক মন্দার কবলে। ভারত তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। ১৩০ কোটি মানুষের বাস, অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গাদের জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে একদল 'ভারতবাসী'র জন্য। ফলে অর্থনীতি একটু টালমাটাল হবেই। সীমান্তে জালনোটের কারবারের সুবাদে এতকাল সমান্তরাল অর্থনীতি চলেছে। ফলে নোট-বাতিলের মতো সাহসী পদক্ষেপ খুব দরকার ছিল। তবে

বিশ্বামিত্র-র কলম

ভারতের অর্থনীতির মূল সমস্যার বিশিষ্ট অর্থনীতিজ্ঞ মনমোহন সিংহ সরকারের আমলেই সুচনা হয়েছিল। এই সমস্যাটি হলো দুর্নীতি। ব্যাঙ্কের ঋণ খেলাপিরা মনমোহন-সোনিয়া সরকারের আমলেই ব্যাঙ্ক প্রতারণার ফাঁদ পেতে ধার নিয়েছিলেন। খোদ অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম দুর্নীতির দায়ে জেলে। কংগ্রেস আমলের আর্থিক দুর্নীতির বোঝাও তাই নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বইতে হচ্ছে। তবু তারই মাঝে ভারতীয় অর্থনীতি যতটা পারা যায় সামনের দিকে এগোচ্ছে।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি থেকে সাম্প্রতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক— কমিউনিস্টরা পাক-আনুগত্য সদা-সর্বদা বজায় রেখেছে। তাই নেহরুর ভারতের অবলুপ্তিতে, কাশ্মীর সমস্যা দীর্ণ ভারতের অবলুপ্তিতে এদের এত ক্ষোভ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারত, পরম পূজনীয় দুই মহামানব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর ভারত, দীনদয়াল-অটলজীর ভারতে দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের স্থান নেই।

তাই অর্থনীতি ভারতবর্ষের সমস্যা নয়। পেটে ভাত না থাকলে কেউ ভোট দেবে না। কমিউনিস্টরা যতই জোরেই চেঁচাক যে ভাতের সমস্যা ঘোচাতে যুদ্ধ বাধিয়ে ভোটে জিতছে বিজেপি, তাতে ঘোড়ার হাসিও বন্ধ হয়ে যাবে। এইবারে মূল সমস্যার দিকে আলোকপাত করা যাক। পাকিস্তানের দাবির উগ্র সমর্থক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সেই পাক-প্রেম স্বাধীনতার পরেও অব্যাহত আছে। নিছক রাজনৈতিক কারণে আজকের সিপিআই (এম) মোদীর কট্টর বিরোধী এমনটা নয় কিন্তু। চীনের দালালি করে এই পার্টিটার জন্ম। ভারতবর্ষের মাটিতে বসে, দেশেরই সর্বনাশ করতে এদেরই এক অংশ থেকে সিপিআই (এম এল)-এর জন্ম, মনীষীদের মূর্তি ভাঙার নক্কারজনক কলুষিতা যাদের হাতেই সুচিত হয়েছিল এবং আজও সেই ট্র্যাডিশান তারা রক্ষা করে যাচ্ছেন। ফলে ভারত পাকিস্তানে হামলা চালালে এই দেশদ্রোহীদের গাত্রদাহ হয় সবচেয়ে বেশি এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে। এরা 'অর্থনীতিবিদে'র ভেক ধরেছে আর সেই মুখোশের আড়ালে দেশদ্রোহিতায় শান দিচ্ছে, দ্বেষের প্রচার করছে।

আমরা সবাই জানি গরিবি হলো বিশ্বের কমিউনিস্টদের মূল পুঁজি। আর ভারতীয় কমিউনিস্টদের মুকুটে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক— অন্ধ ভারত-বিদ্বেষ। আর পাকিস্তান-প্রেম। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি থেকে সাম্প্রতিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক— কমিউনিস্টরা পাক-আনুগত্য সদা-সর্বদা বজায় রেখেছে। তাই নেহরুর ভারতের অবলুপ্তিতে, কাশ্মীর সমস্যা দীর্ণ ভারতের অবলুপ্তিতে এদের এত ক্ষোভ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভারত, পরম পূজনীয় দুই মহামানব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর ভারত, দীনদয়াল-অটলজীর ভারতে দেশদ্রোহী কমিউনিস্টদের স্থান নেই। ■

রাজ্যপাল ভুলে যাবেন না, এটা দিদির বাংলা

সম্মাননীয় জগদীপ ধনকর
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ
রাজভবন, কলকাতা

আপনি বলেছেন, আপনাকে নিয়ে রাজ্যের একের পর এক মন্ত্রীর বক্তব্যে আপনি 'ব্যথিত'। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানকে কীভাবে মন্ত্রীরা 'পর্যটক' বলছেন, কীভাবে তাঁর পদক্ষেপকে 'গিমিক' বলা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রকাশ্যেই উষ্মা ব্যক্ত করেছেন আপনি। বলেছেন, ''মন্ত্রীরা এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীকেই তাঁর মন্ত্রীদের বক্তব্য খতিয়ে দেখতে হবে। মন্ত্রীদের তিনি কীভাবে সামলাবেন, তা ওঁকেই ঠিক করতে হবে।''

আপনি রাজনীতির কারবারি নন। যতদূর জানি, আইন ব্যবসার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন জীবনের বেশিরভাগ সময়। এর পরে রাজ্যপালের দায়িত্ব পেয়েছেন। এসেছেন পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু এই রাজ্য নিয়ে কি পুরোপুরি খোঁজ নিয়ে এসেছেন? এখানে যে দিদি যা চান সেটাই হওয়ার। এখানে প্রধানমন্ত্রীকে গাল দেওয়াও ন্যায়সঙ্গত। এখানে কার কতটা করা উচিত সেটা দিদিই ঠিক করেন। কেউ একটু বাড়াবাড়ি করলে তিনিই ছোটো ছেলে মানুষ করার মতো ধমকে দেন। ব্যাস। এই পর্যন্তই। সুতরাং, আপনাকে মন্ত্রীদের টিপ্পনী শুনতে হবে। ব্যাস। এটাই এই রাজ্যের নিয়ম। প্লিজ অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা টানবেন না।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্র বিক্ষোভে ঘেরাও হয়ে থাকা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়কে 'উদ্ধার' করতে ক্যাম্পাসে গিয়ে শুরুতেই রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছিলেন রাজ্যপাল মশাই আপনি। পরে ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা করলেও কখনও শিলিগুড়ি সফর, কখনও রেড রোডের কার্নিভাল নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বারংবার মুখ খুলেছেন। সর্বশেষ বিতর্ক আপনার জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা ঘিরে। পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রতবাবু বলেছেন, ''বাংলায় কী পুলিশের অভাব যে, রাজ্যপালকে দিল্লির কাছে নিরাপত্তা চাইতে হলো?'' এতেই ফের আপনার উষ্মার বাঁধ ভেঙেছে।

যাদবপুরে কোর্ট-বৈঠকের পরে মন্ত্রী সুব্রতবাবুর নাম করেই আপনি অভিযোগ করেন, ''সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছিল। তা ওঁর জানা উচিত। উনি যে মন্তব্য করেছেন, তা ভুল। আমি আশা করব, উনি ওঁর বক্তব্য পুনর্বিবেচনা করবেন।''

সুব্রতবাবুর প্রতিক্রিয়া, ''কিছু তো ভুল বলিনি! এটা তো ওঁরই সরকার। উনি এই সরকারের সাংবিধানিক অভিভাবক। নিরাপত্তা সংক্রান্ত যা দরকার, তা নিজের সরকারের থেকেই চাইতে পারতেন। আবার এই কথাই বলছি ও বলব!'' এর পাল্টা আপনি অবশ্য ফের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, ''আমার সাংবিধানিক এক্তিয়ারের মধ্যেই কাজ করছি। রাজ্যপাল হিসেবে আমি কোনও কথা বলতে পারব না, তা তো নয়! আমি মানুষের সঙ্গে দেখা করতে পারি, যে কোনও বিষয়ে বলতে পারি, সরকারকে প্রয়োজনে পরামর্শও দিতে পারি। আমার শিলিগুড়ি সফরকে এক মন্ত্রী গিমিক বলেছেন। কোনও মন্ত্রী আমাকে পর্যটক বলছেন! এটা কি তামাশা হচ্ছে? মন্ত্রীরা কী করে এ সব কথা বলতে পারেন!''

মাননীয় রাজ্যপাল, আপনি ভালো করতে চাইছেন এই রাজ্যের। এটা সাধারণে বুঝছে। বেশি করে বুঝছে তৃণমূল কংগ্রেস। বুঝছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বুঝছেন বলেই নিজে চুপ থেকে মন্ত্রীদের দিয়ে আপনার সঙ্গে সংঘাতটা জারি রেখেছেন। এই রাজ্য আসলে কিন্তু ভারতের বাইরে। এটা আপনি ভুলে যাবেন না। ভুলে যাবেন না যে, দিদিমণির আপন দেশে, নিয়মকানুন সর্বনেশে। এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প লাগু হয় না। হলেও তাতে নানা ভাবে বাধা তৈরি করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এটাই দিদির বাঙ্গলা। কারও কাছে মাথা নত করে না। আর সেটা করে না বলেই কেন্দ্রের ডাকা কোনও বৈঠকে যোগ দেয় না। পাছে রাজ্যের উন্নয়নে সেটা কাজে লেগে যায়।

আসলে দিদির থেকে ফোকাসটা যেন না সরে যায়। এখানে সস্তায় চাল থেকে রাস্তাঘাট সবই দিদি দিচ্ছেন, কেন্দ্রীয় সরকার বলে কিছুর অস্তিত্বই নেই। সেটা আপনি কার্নিভাল দেখেও বোঝেননি! কার্নিভ্যাল-প্রসঙ্গ তুলে আপনি বলেছেন, ''সংবাদমাধ্যমকে বলা হয়েছিল সাড়ে ৪ ঘণ্টা আমাকে অন্ধকারে রাখার জন্য। প্রচার পাওয়াটা আমার কাজ নয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা থাকা উচিত। সেদিন উৎসবের কালো দিকটাও বেরিয়ে পড়েছিল।''

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা! বিস্মিত করলেন। সেটা এই রাজ্যে ঠিক করে দেন দিদি। তিনিই বলে দেন স্বাধীনতার সংজ্ঞা। তবে আপনি এসব বোঝেন না সেটা আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি সবই বোঝেন এবং অচলায়তন ভাঙতেই এই সংঘাতের পথে হাঁটছেন বলে আমার বিশ্বাস। চেষ্টা করুন। দেখা যাক সাফল্য পান কিনা।

—**সুন্দর মৌলিক**

ভারত শীঘ্রই পাঁচ ট্রিলিয়নের অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠছে

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগাড়িয়া

বিগত দু' দশকের মধ্যে কোনো সরকারের তরফে সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসিক অর্থনৈতিক সংস্কারের মধ্যেই পড়বে অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামনের নেওয়া সাম্প্রতিক করপোরেট কর হারের ছাঁটাই। এক ধাক্কায় কোম্পানির লাভের ওপর করের হার ৩৫ থেকে ২৫.২ শতাংশে নামিয়ে আনা দেশের উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন রক্ত সঞ্চালনের সহায়ক হওয়ার অনুকূল। নতুন শিল্প উৎপাদকদের ক্ষেত্রে এই কর আবার মাত্র ১৭ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরের মধ্যে যাঁরাই নতুন শিল্পোদ্যোগে হাত লাগাবেন তাঁরাই এই হারের সুযোগ পাবেন।

বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত হার জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশে লাগু থাকা কর হারের সমান। যদিও তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর বা ভিয়েতনামের থেকে তা বেশি। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে যে নতুন শিল্পোদ্যোগগুলি চালু হওয়ার আশা করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কর হার সিঙ্গাপুরের সমতুল হলেও অন্যান্য সব কটি দেশের থেকে কম। এতদিন প্রচলিত নানা ধরনের প্রকল্পে অংশ নেওয়া বা অনেক ধরনের ঋণপত্র কেনার মাধ্যমে কোম্পানিগুলি যে ছাড় পেত তা তুলে দেওয়ায় কর প্রদানের পদ্ধতিও অনেক সরলীকৃত হয়ে যাবে। কমবে ঘুষ, হয়রানি ও কর নিয়ে মামলা মকদ্দমা।

ভবিষ্যতে সরকার যদি আগের মতো নানাবিধ শর্ত সাপেক্ষ ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থাকে মাথা তুলতে না দেয় সেক্ষেত্রে কোম্পানির দেয় কর নিয়ে বিতর্ক, আইন আদালত নিশ্চিতভাবে কমে আসবে। ব্যবসা পরিচালনার পরিবেশেরও উন্নতি ঘটবে। সহজ করে বললে বর্তমানে সরকারের পরিবেশ বান্ধবতা, কারখানার সম্ভাব্য দূষণ ইত্যাদি বহুবিধ ক্ষেত্রে যথাযথ মাত্রা পালিত হচ্ছে কিনা ইত্যাদি নিয়ে কর আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলিকে যে যথেচ্ছ হয়রানি করে থাকে তা নিরসন হয়ে যাবে। কেননা উল্লেখিত বিষয়গুলি পালন করলে যে ছাড় পাওয়া যায় তা ঠিকভাবে মান্য করা হয়েছে কিনা তা নিয়েই করকর্তারা কোম্পানিগুলিকে নাস্তানাবুদ করে থাকে।

ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রেও একই ধরনের হস্তক্ষেপের অবকাশ রয়েছে। এখানেও কাঠামোগত সংস্কার জরুরি। বহু ধরনের ছাড় রয়ে গেছে যার ফলে কর আদায়ের মূল ভিত্তিটিই কিছুটা এলোমেলো হয়ে যায়। বহু টাকা আয় হলেও বিপুল ধরনের ছাড় বিদ্যমান থাকায় শেষমেশ করযোগ্য আয় অনেকটাই কমে আসে। ফলে সর্বোচ্চ কর ৪৩ শতাংশের মতো উচ্চহারে রয়েছে। এই উচ্চহার ও আনুষাঙ্গিক ছাড়ের যুগ্ম উপস্থিতিই করজনিত দুর্নীতি ও বিতর্কের মূল কারণ। ব্যক্তিগত আয়করের সর্বোচ্চ হার কোম্পানির মতো ২৫ শতাংশে বেঁধে দিয়েও সমস্ত আনুষাঙ্গিক ছাড় তুলে দিলে দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গে দেয় কর নিয়ে বিতর্ক, ট্রাইব্যুনাল অনেক কিছুই কমে আসবে।

সরকার যদি দেশের করদাতাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারে যে তাদের ভবিষ্যৎ ট্যাক্স, রিটার্নে বর্ধিত ঘোষিত আয়ের ভিত্তিতে সরকার অতীতের সমস্ত রিটার্নে কী আয়ের ভিত্তিতে কর দেওয়া হয়েছিল তা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, কোনো তদন্ত শুরু করবে না সেক্ষেত্রে কর হার কমলেও আদায় শেষ অবধি বাড়বে। সামগ্রিকভাবে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে করের নিম্ন হার পুষিয়ে যাবে। কোম্পানির লাভের ওপর করের হার কমানোর ফলে লগ্নি করা টাকার ওপর থেকে কোম্পানির হাতে পাওয়া লাভ বাড়বে। ওই বাড়তি টাকাকে পুনর্লগ্নি করার মানসিক প্রবণতাও বাড়বে। কোম্পানি করের নিম্ন হারের ফলে লাভের মাত্রায় বৃদ্ধি ঘটলে করপোরেট সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি ঘটবে। করপোরেট ক্ষেত্রগুলিতে লাভের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ও বাড়তি লাভের প্রত্যাশায় শেয়ার বাজারমুখী হবে। তাহলে, প্রস্তাবিত কর হার ছাঁটাইয়ের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বিশেষ করে সংগঠিত ক্ষেত্রে। কিন্তু সরকার যেন কোম্পানির এই বাড়তি নগদকে কোনোভাবে বন্ড ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের হাতে নিতে না যায় এবং তাকে চলতি খরচ খাতে না ভিড়িয়ে দেয়।

ভারতবর্ষে মূলধন কিন্তু বাজারে মজুত শ্রমশক্তির থেকে অনেক বেশি দুর্লভ। কোম্পানিগুলিকে অধিকাংশ সময়ই মূলধন বা ঋণের ক্ষেত্রে সুদের উচ্চহার সম্পর্কে ক্ষোভ ব্যক্ত করতে দেখা যায়। তারা কিন্তু বেতনের উচ্চহার নিয়ে বিশেষ অভিযোগ করে না। তার ফলে এই দুর্মূল্য পুঁজিকে তারা বিরাট শ্রমিকশ্রেণীর জন্যই নির্দিষ্ট করবে এমনটা ভাবা যেতে পারে। যার ফলে উৎপাদনশীলতায় বৃদ্ধি ঘটার প্রচুর সম্ভাবনা। শুধু তাই নয়, তা নতুন লোক নিয়োগের অর্থ জোগাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের বড়ো বড়ো কর্পোরেটগুলি করে তার উল্টোটাই। তারা মূলধন এমন শিল্পে নিয়োজিত করে যেখানে মূলধনের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বিপুল ও খুবই

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সাপেক্ষ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় উৎপাদন শিল্পের সবচেয়ে বড়ো যে স্তম্ভ সেই অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর থেকে শেষ নিরাপত্তা রক্ষীর মাইনে সমেত কোম্পানির সমগ্র উৎপাদন খরচের মাত্র ৫ শতাংশ।

দেশ কিন্তু আলোচ্য যে উদ্বৃত্ত অর্থ কোম্পানিগুলির হাতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে তা এইভাবে অপব্যয় করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। দেশের নাগরিকদের যদি ভালো চাকরি বাকরির ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে আরও সংস্কার এনে কোম্পানিগুলির বিনিয়োগের নীতিতে নতুন নিয়োগের ওপর বাড়তি গুরুত্ব বাধ্যতামূলক করতে হবে। শ্রম আইনের সংস্কার এই জন্যই জরুরি। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে হাত লাগানোর সময় কিন্তু পেরিয়ে যাচ্ছে।

এই সংস্কার প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে ন্যূনতম ধাপ হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে চল্লিশ বছর আগে চালু করা একশোর বেশি শ্রমিক কর্মরত কারখানায় কোনো অবস্থাতেই শ্রমিক ছাঁটাই চলবে না। এই প্রাচীন আইন বাতিল করতে হবে।

এক্ষেত্রে ২০০৪ সাল থেকে মোদীর নিজের চালু করা গুজরাটের special economic zone-এর জন্য যে সংশোধিত শ্রম আইন চালু হয়েছিল সেটি মডেল হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়লে নিয়োগকর্তা তাঁর শ্রমিককে ছাঁটাই করতে পারবেন। শর্ত থাকবে যে যত বছর কাজ করেছে প্রত্যেক বছরের জন্য ৪৫ দিনের মাইনে তাকে দেওয়া হবে বাধ্যতামূলক।

স্বল্পমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে কোম্পানি করের ওপর প্রস্তাবিত কর হার কমিয়ে আনায় জিডিপি-তে শতকরা ০.৭ শতাংশ ক্ষতি হবে। এই বিষয়টা অবশ্যই সরকারকে ভাবাচ্ছে। এই অবস্থায় সরকারি খরচের পরিমাণ যা আছে তাই রেখে দিলে সামগ্রিক রাজস্ব ক্ষেত্রের ভারসাম্য বজায় রাখায় সমস্যা হতে পারে। অন্যদিকে কর কম আদায় (কোম্পানি কর) জনিত ঘাটতি সামলাতে যদি পরিকাঠামোগত ও অন্যান্য খরচে কাটছাঁট করা হয় সেক্ষেত্রে অর্থনীতিতে সঙ্কোচনের আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে চাহিদার ক্ষেত্রে যখন যথেষ্ট দুর্বলতাই দেখা যাচ্ছে।

এই দু'মুখো অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে বেরোবার রাস্তা আর একবার অর্থনীতিতে উন্নয়নমুখী সংস্কারের চেষ্টা করা। প্রথমত, সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিতে অংশীদারির (Public Sector Enterprise) নিয়ন্ত্রিত বিক্রয়। হাইওয়ে, বিমান বন্দর, বন্দর, রেল স্টেশন, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন প্রভৃতি পরিকাঠামোগত ক্ষেত্রে সরকারের যে বিপুল টাকার সম্পদ রয়েছে তা নির্দিষ্ট মূল্যে প্রয়োজনমতো বেসরকারি হাতে দিয়ে সরকারের বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলির মোকাবিলা করুক। দেশব্যাপী সরকারি সংস্থাগুলির বিরাট পরিমাণ পড়ে থাকা অব্যবহৃত জমিগুলির বিক্রিও এর মধ্যে পড়বে। অবশ্য সরকারি সংস্থাগুলির হাত বদল ও সম্পদ বিক্রির দুটি বিষয়ই সরকারের নীতিগত অ্যাজেন্ডার মধ্যে রয়েছে। এই নীতির দ্রুত রূপায়ণের সঙ্গে অব্যবহৃত জমি বিক্রির ক্ষেত্রেও সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই ক্ষেত্রগুলিতে সরকার সঠিকভাবে এগোতে পারলে ও দৃঢ়তার সঙ্গে হাত লাগালে সরকার এক ঢিলে চার চারটি পাখি মারবার জায়গায় চলে যাবে। (১) সরকারের রাজস্ব ঘাটতি কাঙ্ক্ষিত স্তরে বেঁধে রাখা যাবে। (২) চাহিদার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় থাকবে। (৩) সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির কর্মদক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। (৪) পরিকাঠামোগত সম্পদগুলি ও অব্যবহৃত শহরাঞ্চলের সরকারি জমিগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার হবে। সবগুলি মিলিয়ে সরকারের অর্থনীতির বহর ৫ ট্রিলিয়নে পৌঁছে দেওয়ার যে স্বপ্ন তাকে সাকার করার রসদ এই নিদানগুলির মধ্যেই রয়েছে।

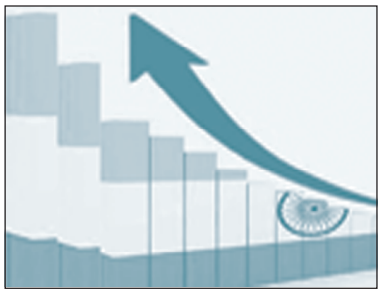

"সঠিকভাবে এগোতে পারলে ও দৃঢ়তার সঙ্গে হাত লাগালে সরকার এক ঢিলে চার চারটি পাখি মারবার জায়গায় চলে যাবে। (১) সরকারের রাজস্ব ঘাটতি কাঙ্ক্ষিত স্তরে বেঁধে রাখা যাবে। (২) চাহিদার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য বজায় থাকবে। (৩) সরকার পরিচালিত সংস্থাগুলির কর্মদক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। (৪) পরিকাঠামোগত সম্পদগুলি ও অব্যবহৃত শহরাঞ্চলের সরকারি জমিগুলির যথাযথ সদ্ব্যবহার হবে।"

রম্যরচনা

সি বি আই

রাজীব শোবার ঘরে আধমোর হয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় বাইরে দরজায় কে যেন খটখট করে কড়া নাড়ল। কড়া নাড়ার শব্দ শুনে রাজীবের বউ রান্নাঘর থেকে গলা চড়িয়ে বলল— 'অ্যাই, কে কড়া নাড়ছিস?' বাইরে থেকে উত্তর এল— 'আজ্ঞে, আমি উন্নয়ন।' বউ দৌড়ে ঘরে এসে রাজীবকে বলল— 'ওগো, উন্নয়ন দরজায় কড়া নাড়ছে।' রাজীব কাগজ পড়তে পড়তেই উত্তর দিল— 'বল, রাজীব এখন বিশ্রাম নিচ্ছে।'

* * *

একটু পরে আবার দরজার খটখট কড়া নাড়া। রাজীবের বউ গলা চড়িয়ে বলল— 'বললাম তো রাজীব বিশ্রাম নিচ্ছে। আবার কেন?' এবার বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় উত্তর এল— 'বলুন, সিবিআই এসেছে।'

আয়ুশ মন্ত্রীর বেস হাসপাতালে আয়ুর্বেদ উপশম কেন্দ্রের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নতুন দিল্লিতে সম্প্রতি আয়ুশ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ যশো নায়েক দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে বেস হাসপাতালে আয়ুর্বেদ উপশম কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য পরিষেবা মহানির্দেশক (ডিজিএএফএমএস) এবং আয়ুশ মন্ত্রকের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী বলেন, আমাদের সেনারা সিয়াচেনের হিমবাহ থেকে থর মরুভূমি পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করেন। তার ফলে তাঁরা বিভিন্ন মানসিক এবং শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি বলেন, আয়ুর্বেদ এবং যোগ সেনাবাহিনীর সদস্যদের মানসিক এবং শারীরিক নানা সমস্যার সমাধানে সাহায্য করে। স্নেহনা এবং স্বেদনের মতো আয়ুর্বেদিক ওষুধ এবং পঞ্চকর্মের মাধ্যমে জীবিকা সংক্রান্ত নানা স্বাস্থ্যজনিত সমস্যার সমাধান করা যায়।

আয়ুশ মন্ত্রকের সচিব বৈদ্য রাজেশ কোটেচা এবং ডিজিএএফএমএস লেফটন্যান্ট সেনাবাহিনীর রিসার্চ ও রেফারেল হাসপাতাল, গাজিয়াবাদের হিন্দোনে বায়ুসেনার হাসপাতাল এবং এক্স সার্ভিসমেন কন্ট্রিবিউটারি হেলথ্ স্কিম বা ইসিএইচএম প্রকল্পে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের জন্য ৫টি পলিক্লিনিকে আয়ুর্বেদ বিভাগ খোলা হবে।

উবাচ

"গত নব্বই বছর ধরে সঙ্ঘ আক্রমণের শিকার হচ্ছে। তবে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সমাজ যেমন আগেও ঐক্যবদ্ধ ছিল, আগামীতেও তাই থাকবে।"

মোহন ভাগবত
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক

সাভারকরকে ভারতরত্ন দেওয়ার প্রস্তাবে সঙ্ঘের হাত খোঁজার অভিযোগ প্রসঙ্গে

"আমি কাশ্মীরের জনতাকে বলতে চাইছি যেসব নেতা হাতিয়ার উঠিয়ে বলিদানের উস্কানি দিচ্ছেন, তাঁদের বলুন প্রথমে নিজেদের বলিদান দিতে তারপর অন্যকে বলিদান দেওয়ার কথা বলতে।"

রামমাধব
বিজেপি নেতা

শ্রীনগরে টেগোর হলের ভাষণে

"গান্ধী সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে জনতার সঙ্গে চলা, তাঁদের সমস্যার সমাধান করাই উদ্দেশ্য। বাপুকে স্মরণ করার মাধ্যমে তাঁর গ্রামজীবনের উন্নয়নের জন্য সারাজীবন অতিবাহিত করার আদর্শকে বাস্তবায়িত করা হবে।"

স্মৃতি ইরানি
বস্ত্রমন্ত্রী

গান্ধী সংকল্প যাত্রার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে

"জঙ্গিদের সব ক্যাম্প আমরা শেষ করে দেব। তাতেও যদি তারা না শোধরায় তা হলে আমরা ভেতরে ঢুকে যাব।"

সত্যপাল মালিক
জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল

পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে জঙ্গিঘাঁটি প্রসঙ্গে

নোয়াখালির রক্তাক্ত দিনগুলি

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

গত জুলাই মাসে আমি হোয়াটস্ অ্যাপ ও ফেসবুকের মাধ্যমে ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসটি উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সেই আহ্বানে সাড়া না পেলেও আমি কিন্তু হতোদ্যম হইনি। ১৯৪৬-এর ১০ অক্টোবর মুসলিম লিগ পাকিস্তান কায়েম করার জন্য নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় যে বর্বর অত্যাচার চালায় তার কিছু বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

কলকাতায় প্রথম তিন দিনে কুড়ি হাজার হিন্দু হত্যার পর, হিন্দুরা যখন গোপাল মুখার্জির নেতৃত্বে শিখ ও বিহারি গোয়ালাদের সহযোগিতায় রুখে দাঁড়ালো, তখন জেহাদিরা রণে ভঙ্গ দিল। এরপর তারা লক্ষ্মীপূজার রাতে নোয়াখালি জেলাকে বেছে নিল। সেখানে হিন্দুর সংখ্যা ১৮ শতাংশ, মুসলমানের সংখ্যা ৮২ শতাংশ। সেদিন রাত্রে মুসলিম লিগ আরম্ভ করল হিন্দু হত্যা, নারী ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ। তারা প্রথমে হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়দের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করল। প্রাণের ভয় দেখিয়ে এক লক্ষ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করা হলো। তাদের মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গি, গোমাংস ভক্ষণে বাধ্য করা হলো। মহিলাদেরকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া হলো। বিবাহিতাদের হাতের শাঁখা ভেঙে দেওয়া হলো। বুকের সন্তানকে কেড়ে নিয়ে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ৫-৬ বছরের শিশুদের খড়ের গাদার উপর ছুঁড়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শিশুরা জলন্ত আগুন থেকে নীচে গড়িয়ে পড়লে তাদের পা ধরে পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হচ্ছিল। প্রাণের ভয়ে মানুষ পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছিল। তাদেরকে কোঁচ, টেটা, বল্লম দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। বাড়ির সব সম্পদ লুঠ করে মহিলাদের গণধর্ষণ আরম্ভ করলো। বাড়ির পুরুষদের হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার উৎসব শুরু করে দিল। ১১ অক্টোবর, তারা হিন্দু মহাসভার সভাপতি রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ি আক্রমণ করলো। কয়েক হাজার মুসলমান দা, বর্শা, কুড়োল, কাটারি নিয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিতে থাকে। রাজেনবাবু একটা একতলা দালান বাড়িতে থাকতেন। দাঙ্গাবাজরা কাঠের দরজায় আগুন ধরিয়ে দিলে পরিবারের সবাই ছাদে গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে সকলকে নামিয়ে নিয়ে কেবল রাজেনবাবুকে নারকেল বাগানের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল হত্যা করার জন্য। ওই সময় রাজেনবাবুর ছেলে গোপাল বসু বুঝতে পেরে বাবা বাবা বলে ছুটে যাচ্ছিলেন, এক দুর্বৃত্ত বল্লম দিয়ে তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে হত্যা করল। রাজেনবাবুর ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তার মুণ্ডচ্ছেদ করে। কিছুক্ষণ ওই কাটা মুণ্ড দিয়ে ফুটবল খেলে। তারপর সেই কাটা মুণ্ড একটা থালায় করে গোলাম সারওয়ারকে উপহার দেওয়া হয়। এরপর রাজেনবাবুর পরিবারের ২২ জনকে একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, মহিলাদের অকথ্য অত্যাচার করে সকলকে উলঙ্গ করে, তাদের পরা ধুতি ও শাড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে, দা, বল্লম, ছুরি দিয়ে অনবরত কুপিয়ে চলছিল দুর্বৃত্তরা। সেকি বীভৎস দৃশ্য! চিৎকার, আর্তনাদ, গোঙানি...একেবারে হত্যা করে না করে কষ্ট দিয়ে মারাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এরপর জেহাদিরা লুটের মাল এবং যুবতী মেয়েদের নিয়ে চলে যায়। এখানে রজেনবাবু স্ত্রী বাণীরানি চৌধুরী ২৫ নভেম্বর বাঙ্গলার কুখ্যাত প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দিকে যে পত্র লেখেন তার কিছু অংশ তুলে উল্লেখ করছি। এই পত্রের কপি আমার সংগ্রহশালায় আছে।

''...গত অক্টোবরে উচ্ছৃঙ্খল দুর্বৃত্তরা আমার বক্ষ হইতে আমার কুমারীকন্যা নমিতা রায় চৌধুরীকে বলপূর্বক ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমায় কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিবার কালে আমি কপালে গুরুতর আঘাত পাই। ওই সময় আক্রমণকারী দুর্বৃত্তরা যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়েছিল তা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণের ফলে রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনান্ত হয়।...''

বর্তমানে প্রজন্মের মানুষ একবার চিন্তা করে দেখুন পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য বর্বর মুসলমানরা কী ধরনের আচরণ করেছিল। ১১ জানুয়ারি ১৯৪৭ গান্ধীজী সদলবলে করপাড়া গ্রামে রাজেনবাবুর বাড়িতে যান। তখন আমার বাবা ও আমার সেজো ভাই জগদিন্দ্র সেই বাড়িতে গিয়ে ওই বধ্যভূমিতে দেখতে পান ২২ জন লোকের রক্ত শুকিয়ে দেড় ইঞ্চি পুরু আমসত্ত্বের মতো হয়ে আছে। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্ত দেওয়াল ও ঘরের ছাদের জমাট বেঁধে কালো হয়ে আছে।

এখানে মুসলিম লিগ নেতা ফিরোজ খান নুনের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। ১৯৪৬-এর জুলাইয়ে তিনি বলেছিলেন— ''ব্রিটিশরা যদি আমাদেরকে হিন্দুরাজত্বের অধীন করে দিয়ে যায় তো আমরা ব্রিটেনকে জানিয়ে রাখছি যে, এদেশের মুসলমানরা এমন ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠান করবেন যা চেঙ্গিস খানের কীর্তিকে নিষ্প্রভ করে দেবে।'' ফিরোজ খান নুনের হুংকারের নগ্নরূপ হলো ১৬ আগস্ট কলকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং অক্টোবরে নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন।

১১ জানুয়ারি ১৯৪৭-এর বিকেলে গান্ধীজী নিকটবর্তী গ্রাম লামচরে সদলবলে উপস্থিত হলেন। লামচর গ্রামের হাই স্কুলের মাঠে প্রার্থনা সভায় ন্যূনতম দু' হাজার লোক উপস্থিত হলো। সভাস্থলে আসন গ্রহণের পূর্বে ২১ জন নারী-পুরুষের অর্ধগলিত দেহ, কারোবা কংকাল মাত্র আজিমপুর মাঠের জলাভূমি থেকে উদ্ধার করে স্কুল প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছিল। গান্ধীজীর নির্দেশে ডাঃ সুশীল আনোয়ার এম.বি. শবগুলি পরীক্ষা করেন। তাঁর স্বহস্তে লিখিত রিপোর্ট খানি বিশিষ্ট জননায়ক লামচর গ্রামে নিবাসী মনোরঞ্জন চৌধুরীর নিকট রক্ষিত ছিল। (তার পরিবারের সদস্যদের নিকট এখনো আছে কিনা জানি না)। স্থানীয় জনসাধারণ এই মৃতদেহগুলি রায় চৌধুরীর পরিবারের বলে শনাক্ত করেন। গভীর রাত্রিতে প্রার্থনা সভার পর লামচর

চৌধুরীবড়ি বটগাছের পূর্ব দিকের খোলা জায়গায় শবদেহগুলি সৎকার করা হয়।

নারায়ণপুরের জমিদার সুরেন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি আক্রমণ : কাশেমের ফৌজ 'মালাউনের রক্ত চাই' ধ্বনি দিতে দিতে সুরেন্দ্রনাথবাবুর কাছারিবাড়ি আক্রমণ করল। ওই বাড়িতে সুরেন্দ্রনাথবাবু তার ভাই নগেন্দ্রনাথ বসু ও কতিপয় কর্মচারী বাস করছিলেন। তার কাছে একটি বন্দুক ও কিছু কার্তুজ ছিল। আক্রান্ত হয়ে তিনি বন্দুক হাতে আক্রমণের মোকাবিলা করেন। কার্তুজ শেষ হলে মুসলমানরা দূর থেকে লক্ষ্য করে মাছ ধরার শানিত লৌহ টেটা ছুঁড়তে থাকে। তিনি ক্ষতবিক্ষত দেহে ধরাশায়ী হলে আততায়ীরা তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করে অর্ধমৃত অবস্থায় জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে যতক্ষণ না তার প্রাণ বায়ু নিঃশেষ হয় ততক্ষণ বাঁশ দিয়া চেপে ধরে সুরেন্দ্রবাবুকে হত্যা করে। তার ভাই এবং হিন্দু কর্মচারীদের নির্মমভাবে বর্বর মুসলমানরা হত্য করে।

চিত্ত দত্তরায়ের আত্মাহুতি : শায়েস্তানগরের চিত্ত দত্তরায়ের বাড়ি কয়েক হাজার মুসলমানের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর বৃদ্ধ মা ও সন্তানদের নিজের বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে নিজেও গুলিতে আত্মহত্যা করেন। গুলি না থাকায় তার স্ত্রী ও একটি শিশু সন্তান রক্ষা পায়।

গোপাইবাগের দাসদের বাড়ি : কয়েক হাজার মুসলমান এই বাড়ি আক্রমণ করে ১৯ জন পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে। অর্ধমৃত পুরুষদের দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। মহিলাদের ওপর চলে পাশবিক অত্যাচার।

নোয়াখালি চৌধুরী বাড়ি : কয়েক হাজার জেহাদি মুসলমান আক্রমণ করে পুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে। মহিলাদের ওপর চলে পাশবিক অত্যাচার। বাড়ির যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বর্বর মুসলমানরা মাটিতে গর্ত করে মৃতদেহগুলি গর্তে ফেলে। কিছু জীবন্ত মানুষকে ওই গর্তে ফেলে মাটিচাপা দেয়। ওই বাড়ির প্রভুভক্ত কুকুরটি কবরের ওপর পড়ে অনাহারে দিন যাপন করছিল। গান্ধীজী ও তার সঙ্গীরা পরিদর্শনে গেলে কুকুরটি কয়েকবার গান্ধীজীর পায়ের নিকট গড়াগড়ি খেতে আরম্ভ করে, কিন্তু কেউ এর তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। তারপরও কুকুরটি হিন্দু মহাসভা নেতা নির্মল চন্দ্র চ্যাটার্জির (সিপিএম নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জির পিতা) ধুতি কমড়ে ধরে তাকে টানতে টানতে গর্তের নিকট নিয়ে গেলে তিনি স্থানীয় লোকদের থেকে জানতে পারেন ওই গর্তের মৃতদেহ এবং কিছু হিন্দুকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়েছে। পরে ওই গর্ত উন্মোচন করে মৃতদেহগুলি গান্ধীজী এবং তার সঙ্গীরা দেখতে পান। নির্মল চ্যাটার্জি ওই প্রভুভক্ত কুকুরটিকে একটি খাঁচায় করে ট্রেনযোগে কলকাতায় আনেন এবং তার বাড়িতে অতি যত্ন সহকারে আমৃত্যু প্রতিপালন করেন।

গোবিন্দপুর গ্রামের পৈশাচিক কাণ্ড : যশোদা পাল ও ভারত ভুঁইয়ার বাড়িতে পুরুষদের হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে বাঁশ দিয়ে চেপে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। সদ্য স্বামী ও পিতৃহারা মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়। তাদেরকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে পায়ের পুড়ো আঙুল দিয়ে সিঁথির সিঁদুর মুছে দেওয়া হয়।

নন্দীগ্রামের ঘটনা : ওই গ্রামের বৃদ্ধ কুঞ্জ কর্মকার ও তার পরিবারের কয়েকজন পুরুষ সদস্যকে হাত-পা তার দিয়ে বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে জীবন্ত পোড়ানো হচ্ছিল, তার সঙ্গে চলছিল মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার। ওই গ্রামেরই শিক্ষকের স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করার সময় বাধা দিলে স্ত্রীকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে তার বুকের ওপর স্বামীকে বসিয়ে নৃশংসভাবে ছুরি বল্লম দা দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হলো। সঙ্গে উল্লাসিত মুসলমান জেহাদিরা আল্লাহু আকবার, মালাউনের রক্ত চাই, পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছিল। এভাবে সমস্ত গ্রামের হিন্দু বাড়িগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল।

দালাল বাজারে জমিদার বাড়ি ধ্বংস : নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে জেহাদিরা হিন্দুদের একত্রিত করে, সোনাদানা কেড়ে নিয়ে, বাড়ি ঘরের জিনিসপত্র লুঠ করে পুরুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করে আর যুবতীদের অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। চট্টগ্রামের জনপ্রিয় শিক্ষক অক্ষয় চক্রবর্তীকে কয়েকজন মুসলমান ছাত্র প্রাণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইসলামে দীক্ষিত করে। তিনি তার ভাইকে পত্র দিয়ে জনালেন আমরা সকলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইসলামে ধর্মান্তরিত হইয়াছি। চিঠির প্রথমে তিনি অভ্যাসবশত শ্রীশ্রী দুর্গা সহায় লেখার অপরাধে তারই মুসলমান ছাত্ররা তাকে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। করপাড়ার নোয়াখালি হিন্দু নিধনের প্রধান সেনাপতি গোলম সারওয়ারের শিক্ষক হরিশ পণ্ডিত নৃশংস ভাবে নিহত হন তারই প্ররোচনায়।

প্রতিবেদকের হিসেব মতো নিদারুণ ভয়ে ওই সময় ১৫০ থেকে ২০০ জন আসন্নপ্রসবা মহিলার গর্ভপাত হয়ে যায়। তারা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ওই সময়কার অসংখ্য তথ্য এই প্রতিবেদকের নিকট আছে। কারণ ওই সময় আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজে ওই অঞ্চলে গিয়েছিলাম। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসের বর্বর মুসলমান অত্যাচারের সময় গঠিত Noakhali rescue, relief and rehabilitation committee এই দাঙ্গার কারণ এবং অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখিত পুস্তিকা আকারে Noakhali Tipperah Tragedy-র মুখবন্ধ কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জেবি কৃপালিনীর স্ত্রী উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালিনী লিখে দিয়েছিলেন। সেই বই এখন দুষ্প্রাপ্য। ইচ্ছা করেই দেশবিভাগের খলনায়করা সেই বইয়ের সব কপি ধ্বংস করে দিয়েছে।

নোয়াখালির হিন্দু নিধনের পর গান্ধীজী যখন নোয়াখালির শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থান করছিলেন তখন জওহরলাল নেহরু ও আচার্য কৃপালনী সেখানে গিয়ে দেশভগের সম্মতি আদায় করে অনেন (বিস্তারিত জানতে হলে আমার লেখা কথিত কাহিনি পড়ে দেখতে পারেন)। নোয়াখালি থেকে ফিরে জওহরলাল নেহরু ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন, তখন নোয়াখালি সম্মেলনীর এক প্রতিনিধিদল তার সঙ্গে দেখা করে একটা স্মারকলিপি দিতে গেলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং এই স্মারকলিপিতে সুরাবর্দিকে দিতে বলেন। ভগ্ন মনোরথ হয়ে তারা ফিরে আসেন। লক্ষ্মীপুজোর রাতে নোয়াখালির এই হিন্দু নিধনের কথা মনে পড়লে আজও আমি কেঁপে উঠি। ■

মানুষ আর প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত সঙ্গম

অভিজিত দাশগুপ্ত

মনে পড়ে, অনেকদিন আগে, সেই সত্তর দশকের গোড়ায়, স্কুল ডিঙিয়ে সবে আমরা কলেজে ঢুকেছি। হাতে এল বিনয় ঘোষের আনকোরা নতুন বই— মেট্রোপলিটন মন ও মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ। আলবেয়ার কাম্যুর নাম তখন সবে কানে গেছে। কফিহাউসের টেবিলে টেবিলে তাঁকে নিয়ে তুমুল তর্ক চলে দিন থেকে রাত। কিন্তু আমি বা আমার মতো অনেক ছেলেছোকরাই তাঁর লেখা পড়ে ফেলার সুযোগ পাইনি। বিনয় ঘোষের বইটায় দেখি, সশরীরে বিরাজ করছেন আলবেয়ার কাম্যু আর তাঁর আউটসাইডার উপন্যাসের আলজিরিয়ান নায়ক, যে তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছে টেলিগ্রাম মারফত। কবে মারা গেছেন মা? বৃদ্ধাশ্রম থেকে যে টেলিগ্রামটা পাঠানো হয়েছে সেটা দেখে সে কিছুই বুঝতে পারে না। মারা গেছেন কি আজ? না, গতকাল? ওরা জানাচ্ছে, আগামীকাল মায়ের অন্ত্যেষ্টি। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে একবার তাহলে পৌঁছতে হয়। বসের কাছে ছুটি নিতে গেল মরসো। কবে মারা গেলেন মা? ওপরওয়ালার নির্লিপ্ত প্রশ্নের জবাবে আরও নির্লিপ্ত মরসো বলল : 'মা মারা গেছেন আজ। কিংবা গতকালও হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।'

শিউরে উঠেছিলাম সেদিন। এমন কি হয়? হতে পারে কোনোদিন? একেবারে সাদা কাগজের রিলের মতো মন--- যেখানে কোনোকিছুরই দাগ ধরে না, ছাপও পড়ে না! বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী আঘাতে মনুষ্যত্বের বোধটাই এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল সেদিনের ইউরোপ আর তার সংলগ্ন দেশগুলোয়, যে-অভিজ্ঞতা আমাদের মতো

পথের পাঁচালী ছবি থেকে। সৌজন্যে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দেশে চিন্তার অতীত। দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, মনুষ্যত্বের অপমান এদেশে কম নেই। কিন্তু সেই যন্ত্রণা আর তার অবসাদ কখনও আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে যায়নি যার জেরে আর একজন মরসো জন্ম নিতে পারে। আঘাত আছে, তিক্ততা আছে, লড়াই আছে। কিন্তু তার মধ্যেই আছেন একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন বিভূতিভূষণ। আছে এদেশের অসাম্য-পীড়িত সমাজ। তারই পাশে রয়েছে আশ্চর্য এক প্রকৃতি, সমস্ত তিক্ততার বিষ যে নিঃশেষে গিলে ফেলতে পারে। গত শতাব্দীর বিশের দশকের শেষ আর তিরিশের দশকে গোড়ায় বিভূতিভূষণ যখন লিখতে শুরু করলেন, গোটা দেশ তখন আর্থিক সংকটে ধুঁকছে। ভালো ভালো রেজাল্ট করা ছেলেরা চাকরি না পেয়ে বাড়িতে বসে আছে মাসের পর মাস। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন নানা কারণে ঝিমিয়ে পড়েছে। দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ ছাড়া মধ্যবিত্ত জীবনের যেন আর কিছুই নেই। কিন্তু রিক্ততাই কি সব? ব্যক্তি-মানুষের দুর্ভোগ, পরস্পরের সম্পর্কে অবিশ্বাসের ভারী হাওয়া, মনস্তত্ত্বের জটিল হাঁটাচলা— এসবের বাইরে কি জগৎ আর জীবনে অন্য কিছুর অস্তিত্ব নেই? ভারতবাসীর আবহমানের জীবনদৃষ্টি তো সেকথা বলে না। মানুষের সমাজের চারপাশেও যে ঘুরে বেড়ায় অন্য এক বৃহত্তর জগৎ! সে জগতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে সীমাহীন অরণ্য, অনাদিকালের মহাবৃক্ষ, আকাশভরা নক্ষত্রপুঞ্জ, আদিম পর্বতমালার উদার বিস্তার, আর হুরি-পরি ঘেরা অপ্রাকৃত জগতের ইশারা। আমাদের চেনা সমাজের বাইরে, গভীর সেই অরণ্যে বাস করেন হয়তো কোনও জনজাতি রাজার বংশধরেরা। আর বাস করে প্রকৃতির সঙ্গে যুগ যুগ ধরে মিশে থাকা মানুষ। আমাদের সমাজ আর সম্পর্কের চারপাশে আপনা থেকেই জেগে রয়েছে যে পৃথিবী, যে পায়ে চলা গ্রাম্য পথ, শিকড় নামা বটগাছ; পাহাড়ি শুঁড়িপথ বেয়ে পৌঁছতে হয় সে বনবাসী রাজ পরিবারের সমাধিভূমিতে— এই সবই আসলে আমাদের বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ। বিভূতিভূষণ তাঁর দৃষ্টি আর অনুভূতির অখণ্ডতা দিয়ে বুঝতে ও বোঝাতে চেয়েছিলেন, আমার বা তোমার বিলাস-তৃপ্তি-আক্রোশ বা দুর্ভোগের সঙ্গে এই বিশাল পৃথিবীর বাস্তবতার কোনও বিরোধ নেই। চারপাশের সবকিছু নিয়ে সবাইকে নিয়েই জীবন এবং জগৎ। বিভূতিভূষণ যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন,

পাহাড়, নদী, অরণ্য, বন্যপ্রাণীর দল, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র— যাদের সঙ্গে আমাদের বেঁচে থাকা লতায় পাতায় জড়িয়ে রয়েছে, দিনের পর দিন তাদের বিস্মৃত হয়ে থাকার অধিকার আমাদের নেই। কারণ এই সবকিছু নিয়েই আমাদের বিশ্বসংসার। যেন বলতে চেয়েছেন, সংসারের বাইরে যেমন কেউ নন, তেমনি জগৎকে বাদ দিয়েও কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

বিভূতিভূষণের এই বৃহত্তর জীবনবোধ কতখানি পরিব্যাপ্তি ছিল, লেখক-সাংবাদিক পরিমল গোস্বামী তার এক চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। লিখেছেন; 'তাঁর দৃষ্টি বারবার অনাহারক্লিষ্ট মরণোন্মুখ অখ্যাত- অবজ্ঞাত গ্রাম্য লোকদের দিকে প্রসারিত হয়েছে। তাদের সেই হতাশা আর দীনতার গুহান্ধকারে, যেখানে সহজে কারোর দৃষ্টি পৌঁছয় না, সেখানে বহু যত্ন করে তিনি দৃষ্টি মেলেছেন। ...গ্রামের অপরিচিতদের মধ্যে গিয়ে গিয়ে কে কী খেতে পায়, চাল কী দরে কেনে, শুধু সেই জিজ্ঞাসা। বিভূতিবাবু এইসব গ্রাম্য নিঃস্ব মানুষের মধ্যে, গাছপালা ঝোপঝাড়ের মধ্যে, অরণ্যের মধ্যে কাকে খুঁজে বেরিয়েছেন সমস্ত জীবন? কী খুঁজেছেন, কে তার উত্তর দেবে?'

এইসব অখ্যাত অবজ্ঞাত গ্রাম্য মানুষ আর জনপদকে প্রকৃতির সীমাহীনতার পটভূমিতে ফেলে যখন তিনি নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্টে ঢুকে পড়েন, সেই পরীক্ষানিরীক্ষার ফল একেবারে অন্যরকম হতে বাধ্য। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি, মানুষের পাশাপাশিই থাকে। কিন্তু মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-মত্যু কিংবা জয়-পরাজয়ের সঙ্গে তাদের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রকৃতি আবহমানের। যার মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে বয়ে চলে আবহমানের মনুষ্যজীবন।

দুই

আজ থেকে বছর তিনেক আগে, ২০১৬ সালে, কলকাতার সত্যজিৎ রে সোসাইটি এবং আন্তর্জাতিক প্রকাশক হার্পার কলিনসের সৌজন্যে একটি আশ্চর্য বই বিভূতিভূষণ ও সত্যজিৎ অনুরাগীদের হাতে এসে পৌঁছয়। বইটার নাম— 'দ্য পথের পাঁচালী স্কেচবুক'। পথের পাঁচালী নামে কোনও সিনেমা কোনোদিন করে ওঠা যাবে এমন কল্পনাও যখন সত্যজিৎ করে উঠতে পারেননি, সেই সময়ে দোকান থেকে ড্রইং খাতা কিনে আপনমনে তিনি সে ছবির স্কেচ করে যেতেন। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে পরস্পর জড়িয়ে থাকা প্রকৃতি আর মানুষ দুরন্ত সুষমায় ফ্রেমের পর ফ্রেম হয়ে ফুটে উঠছিল সেই ড্রইং খাতায়। পরপর দেখলে আমাদের মনে হতে পারে যেন সিনেমাটাই দেখছি। এই স্কেচবুক সত্যজিৎ পরবর্তীকালে প্যারিসের 'সিনেমাথেক ফ্রাঁসোয়া'কে দান করে দেন। বহুকাল পর, সত্যজিতের মৃত্যুরও বেশ কয়েক বছর বাদে, দ্য ক্রাইটেরিয়ন কালেকশনের উদ্যোগে স্কেচবইয়ের এক ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায় ও তাঁর সহযোগীরা হাতে পান। তার ওপর ভিত্তি করেই মুদ্রিত হয়েছে এই বই। এক সকালে চা খেতে খেতে স্কেচগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলাম। আর আমার চোখের সামনে থেকে দীর্ঘদিনের এক অপপ্রচারের মেঘ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। সত্যজিৎ সমালোচকদের একটা গোষ্ঠী অনেক বছর ধরে নাগাড়ে রটিয়ে আসছিলেন যে, সিনেমার পথের পাঁচালী বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী নয়। পাহাড়, নদী, দূরের রেলগাড়ি, শাপলা ফুল, পদ্ম, কচুরিপানা, অরণ্যের মহাবৃক্ষের দল বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসকে যেভাবে লতায়-পাতায় জড়িয়ে রেখেছে, সত্যজিৎ নাকি তাকে অনেকখানি পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সিনেমায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ, তাদের বিবর্ণ জীবন, শোক-দুঃখ-মৃত্যু, দারিদ্রের দাঁত-নখ বের করা বাস্তব ছবিই শুধু ফুটে উঠেছে। পথের পাঁচালীকে যেজন্য নাকি বলা হয় দরিদ্র ভারতবর্ষের বিশ্বস্ত ডকুমেন্টেশন। সত্যি কি তাই? তরুণ সত্যজিতের আঁকা এই স্কেচবুকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পদ্মফুল, পাখির ডাক, পুকুরে সাঁতরে চলা হাঁসের পাল, পেয়ারা গাছে দুর্গার ঢিল ছোঁড়া, চড়কের ঢাক, অন্ধকার দাওয়ায় বসে ইন্দির ঠাকরুণের কাছে অপু-দুর্গার গল্প শোনার দৃশ্য। আছে মেঘ, আছে মাথায় ছেয়ে থাকা বট-অশ্বত্থ, আছে পুকুরের জলে বড়ো বড়ো বৃষ্টির ফোঁটার গীতিকাব্যের সুষমা। তাহলেও সিনেমা তৈরির অনেক আগে থেকেই যে বিভূতিভূষণের নিস্পৃহ পরিপূর্ণতা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে নিচ্ছিলেন সত্যজিৎ। সমালোচনা কি তবে করতে হবে বলেই করা?

মৌলিক বিরোধ আসলে কোথাও নেই। বিভূতিভূষণের পৃথিবীকেই অসীম মমতায় নতুনভাবে নির্মাণ করে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। আর সেই অনবদ্য সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে অন্য একটি উপাদানকে--- ক্যামেরা। বিভূতিভূষণের অশনি সংকেত মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষের কাহিনি। সেই দুর্ভিক্ষের সঙ্গে প্রকৃতির তো কোনও লড়াই নেই। সত্যজিতের অশনি সংকেতের প্রকৃতিও তাই আগের মতো সুন্দর। মানুষের চক্রান্ত, শয়তানি, নীচতার কোনও ছাপই সেই লিরিক্যাল সৌন্দর্যকে বিচলিত করতে পারে না। সৌন্দর্য সৃষ্টির পদ্ধতিটুকু শুধু আলাদা হয়ে যায় ক্যামেরার ক্লোজ, মিড লং, আর লং শটের জাদুতে। ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যুর মুহূর্তে বাঁশঝাড়ে বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দে।

মনে করুন আরণ্যকের সেই সরস্বতী কুণ্ডীর কথা। সেই যেখানে হুরি-পরিরা সরোবরের জলে নামে। বন কেটে বসত গড়ার কাজে লেখককে মাঝে মাঝেই জরিপের ক্যাম্পে রাত্রিযাপন করতে হয়। সেদিন সঙ্গে ছিল আমিন রঘুবর প্রসাদ। তার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলতেই রঘুবীর বলল : ''হুজুর ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাতে হুরি-পরিরা নামে; জ্যোৎস্না রাতে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ওইসব পাথরের ওপর রেখে জলে নামে। সে সময়ে যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায়, মাঝে মাঝে পরিদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মতো জেগে আছে।...''

অরণ্য নিশ্চিহ্ন করে জনপদ তৈরির দায়িত্ব নিয়ে লবটুলিয়া- বইহারে এসেছিলেন লেখক। কাজ শেষ করে বছর পাঁচেক পরে ফিরে গেলেন শহরে। কিন্তু মাঝের এই সময়টায় পাহাড়, জঙ্গল, আদিম কৌম সমাজ, অরণ্যের প্রাণী আর অরণ্যচারী মানুষ এমনভাবে তাঁকে বদলে দিয়ে গেল, যে অভিজ্ঞতার কোনও তুলনা সারাজীবনে আর কখনও তিনি পাবেন না। ■

হৃদয়ের দীপশলাকা বিভূতিভূষণের ‘হীরা মানিক জ্বলে’

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

লম্বকে বেড়িয়ে ফিরে আমার পাতানো ডাকাবুকো বোন সেবার দেখা করে গেল। সুপ্রীতি। স্বামী ব্যস্ত ডাক্তার। সই-কয়েকজন গেছে বালি দ্বীপে। সেখানে একটা স্টেডিয়ামে বসে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে মাঠে ঢুকে পড়ে সমুদ্রের জল! জেগে থাকে পাথরের গ্যালারি। তারপর ভাটার টানে জল সরে যায়, জেগে ওঠে ধ্যানমগ্ন শিব। মাঠে? না না—জলে।

এই মন্দিরের কথা কি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন? কে জানে— যে আশ্চর্য কুশলতায় তিনি চম্পা দেশের ঘন জঙ্গলে জোঁক-সাপ-মৌমাছির মধ্যে আবিষ্কার করেন লুপ্ত এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরী, সেই নগরীর সন্ধান পায় তার নায়ক সুশীল মুস্তাফি, তা অভাবনীয়। ১৯৪৬-এর মে মাসে ডি. এম. লাইব্রেরি বইটি প্রকাশ করে ‘হীরা মানিক জ্বলে’। এর আগে ডি. এম. লাইব্রেরি ১৯৪১, বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৯৪২ চৈত্র সংখ্যা সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত ‘মৌচাক’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস সাধারণভাবে কিশোর পাঠ্য বলে সমালোচকরা নির্ধারণ করেছেন। লেখাটি সম্পর্কে শিশু-সাহিত্যিক লীলা মজুমদার লিখেছেন : গোপাল হালদার যে বলেছিলেন, বিভূতিভূষণের সাহিত্য নাকি ‘অর্ন্তমুখী’। লীলা মজুমদারের মতে এটি ভুল—‘শিশু সাহিত্যের গতিই হলো বাইরের দিকে, বিশেষ করে রহস্য ও দুঃসাহসিক অভিযানের মধ্যে।’ (ভূমিকা : ‘বিভূতি রচনাবলী’; নবম খণ্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা; নবম মুদ্রণ, পৌষ ১৪০৫ ব.)। একই মানদণ্ডে ‘চাঁদের পাহাড়’, ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’, ‘মিস্‌মিদের কবর’ আর ‘হীরা মানিক জ্বলে’ বিচার করেছেন লীলা মজুমদার। আমাদের সামান্য আপত্তি জানিয়ে রাখলাম।

আগে গল্পে আসি। সুশীল মুস্তাফি দূর গ্রামের বনেদি পরিবারের তরুণ। সেই পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন কোনোক্রমে চলে যায়—চাকরি করে না কেউ। সুশীল দেখল তাদের আশ্রিত ঘরজামাইদের বংশ রায়দের অবনী এসে নাগরিক বৈভব দেখিয়ে গেল। মন কেমন নিয়ে গেল সে আত্মীয় সনৎ-এর ভাড়া বাড়িতে। গড়ের মাঠে দেখা হলো জাহাজের খালাসি জামাতুল্লার সঙ্গে। বাবু ম্যাচেস আছে? সামান্য সংলাপ—সংযোগ থেকে খুলে গেল গল্পের রহস্য দুয়ার। এই লেখার পাঠককে অনুরোধ উপন্যাসটি পড়ে নিন। সুনীল জানল জামাতুল্লা ডাচ ইন্ডিজ দ্বীপের দুঃসাহসী নাবিক ছিল। তার ছিল একটি আশ্চর্য সিলমোহর। সেটি নাকি বহুমূল্য। সেটির প্লাস্টার অব পেরিসের ছাপ তোলার সময় জানা গেল এটি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশের। কলকাতা জাদুঘরের কর্মী ডা. রজনীকান্ত বসুর মতে ওঙ্কারভাটে ১৩শ শতাব্দীতে এইরকম সিলমোহর পাওয়া যেত।

জামাতুল্লা পশ্চিমি মুসলমান। কলকাতায় থেকে বাংলা শিখেছে। তার অভিজ্ঞতা বিস্তৃত। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া-সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভারত মহাসাগরীয় বন্দরে যাত্রার মাঝখানে এক আজানা ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ‘সহসা এক নির্জন দ্বীপে আবিষ্কার করে অজানা এক হিন্দু সাম্রাজ্যের রাজধানী—আর তার বিপুল রত্নভাণ্ডারের সম্ভাবনার ইঙ্গিত। সুশীল সনৎ জানল তামিলনাড়ুর কোটি চম্পা গ্রামের এক নাবিক নটরাজনের বিধবা স্ত্রীর প্রাপ্য অর্থ ভাঙ্গাল না—কারণ জামাতুল্লা নটরাজনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সেই সিলমোহর আর পুরোন বহুমূল্য মানিক ছাড়াই, বেরুল তারা অভিযানে। আবার সেই ডুবো পাহাড়, চীনা নাবিক, মালয়ী মুসলমান কুলি আর ইয়ারহোসেনের মতো নিষ্ঠুর লোভী সঙ্গী! মাঝে মাঝে ‘পিজন ইংলিশ’ আর আনুসঙ্গিক।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে সুশীল পড়াশুনো করে জানল ভারতের গৌরবের সেই দিনগুলির কথা। বাঙ্গালি বনেদি পরিবারের ছেলে সুশীল, তার মনে দক্ষিণ মহাসমুদ্রের ঢেউ এসে শুনিয়ে গেল সুদূরের ডাক : ‘বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনি, চম্পা রাজ্যের কথা—সুদূর সমুদ্রপারের ভারতীয় উপনিবেশ চম্পা। ভারতবাসী অসির তীক্ষ্ণগ্রভাগ দিয়ে সে দেশের মাটি পাথরের গায়ে নাগরাজা বাসুকী, শিব পার্ব্বতী ও বিষ্ণুমূর্তি অমর করে রেখেছে।’ সবটা ইতিহাস নয়। ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা মিশে এক ভবিষ্যতের অনাগত নির্মাণই তো দেশ গঠনের ভূমিকা তৈরি করে। যা ছিল তাকে অবলম্বন করা, যা হয়েছে তাকে অতিক্রম করার জন্য চাবিকাঠি হলো আদর্শের উদ্দীপনা। বিভূতিভূষণ তাঁর এই অপূর্ব কিশোর উপন্যাসে সেই চেষ্টা করেছেন। ‘থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে/দেখবো এবার জগৎটাকে’—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাহিনি বা ইতিহাস তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশ নৌ-বিদ্যার পাশাপাশি পর্তুগিজ—স্পেনীয় আর ওলন্দাজ প্রভৃতি শক্তির আবির্ভাবই ইউরোপীয় নবজাগরণ ও শিল্পবিপ্লবের ভূমিকা। আর তারই ফল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার। সাহিত্য কোনো আকাশের ফুল নয়—এজন্যই তো সমুদ্র-নিবিড় কিশোর উপন্যাসগুলি ইংরেজি সাহিত্যের ভুবনকে বদলে দিয়েছে। ‘রবিনসন ক্রুশো’ বা ‘ট্রেজার আইল্যান্ড’ তো শুধু উপন্যাস নয়— উপনিবেশ স্থাপনের দুর্জয় আগ্রহের, উদ্দাম অভিযান ও সাহসের কাহিনি। কল্পনা আর বাস্তবের এমন মিলিত যাত্রা সাহিত্যের প্রাণ। বিভূতিভূষণের কিশোর উপন্যাস তিনটিতেই তা ধরা পড়ে। ‘চাঁদের পাহাড়’ (১৯৩৭), ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’ (১৯৪০) আর ‘হিরে মানিক জ্বলে’ (১৯৪৬)—তেমনি অভিযানের গল্প। এর সঙ্গে ‘মিসমিদের কবর’ (১৯৪২) মিলিয়ে নিতে চাইল—সেটি অন্য রসের কাহিনি—রহস্য রোমাঞ্চ গল্প। ‘চাঁদের পাহাড়’ আফ্রিকা মহাদেশ, ‘মরণের ডঙ্কা বাজে’-র পটভূমি চীন-জাপানের যুদ্ধ। ‘হিরে মানিক জ্বলে’ আমরা বেছে নিলাম।

কারণ তা কেবল কল্পনা দিয়ে বাস্তবের দিকে যাত্রা বা মায়া রচনা নয়। এক সুদূর অতীত বাস্তবের দিকে সাংস্কৃতিক উজান যাত্রা—Cultural journey .

'রবিনসন ক্রুশো' – জাহাজডুবির পর 'ফ্রাইডে আইল্যান্ড'-এ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসারের কাহিনি। 'ট্রেজার আইল্যান্ড' বোম্বেটেদের অন্যায় অমানবিক হিংস্র লুণ্ঠনের---আসলে হয়তো সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনেরই আসল গল্প। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভালো ও মন্দ—দুয়েরই ছবি এইভাবে স্পষ্ট হয়েছে। একে বলবো বাস্তব ও কল্পনার বিমিশ্রণ। 'হিরে মানিক জ্বলে' কি রূপকথা? লীলা মজুমদারের কলমে তেমনই ব্যাখ্যা। ঝংকার তোলে যেন। কাহিনির নাম, স্থান নাম—সবই সুন্দর, রূপকধর্মী। 'শুনে কান মুগ্ধ হয়'; সুশীলের গ্রাম 'সুন্দর পুর'; তার নামও তেমনি—'সুশীল'; 'ছেলেটিকে ভালো মানুষ মনে হতো'। ক্রমে যে গল্প গড়ে উঠল তা 'অস্বাভাবিক বা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু অসাধারণ।' তার পরিণতি লীলা মজুমদারের ভাষায় 'অসাধারণ কিন্তু অসম্ভব নয়।' আমরা বলতে চাই এই কাহিনি 'অস্বাভাবিক বা অসম্ভব' তো নয়ই—'অসাধারণ'ও নয়। বরং অতীত অকল্পনীয় কিন্তু অনিবার্য। যা ছিল, তা আবিষ্কার—রোমাঞ্চকর অতীত মনে হতেও পারে; ইতিহাস এভাবেই চলে। কিন্তু যা ছিল তার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হতে থাকলে অতীত বর্তমানকে ভবিষ্যৎ পুনর্গঠনে সহায়তা করে। কাহিনি তখন কল্পনা থাকে না—ভবিষ্যতের পুনর্গঠনের আবেগ সঞ্চার করে। 'রবিনসন ক্রুশো' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা—তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের সময়। 'হিরে মানিক জ্বলে' নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বিস্তারের ইতিহাসের রহস্যলোকে যাত্রা। রবিনসন গেছে অনাবিষ্কৃত দেশে, সুশীল সনৎ গেছে অজানা কিন্তু এক সময়কার ভারতীয় সংস্কৃতির দেশে---অর্থাৎ 'রবিনসন ক্রুশো' হলো সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির একমুখী প্রসারের কাহিনি। আর 'হিরা মানিক জ্বলে' ভারতীয় সংস্কৃতিকে ফিরে দেখার কাহিনি। 'রবিনসন ক্রুশো'কে যদি আধুনিকতা বলি, Modern; 'হিরে মানিক জ্বলে'র ভঙ্গিটি উত্তর আধুনিক, Post Modern আর মায়াবী।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'সুশীল ইতিহাসের ছাত্র নয়।' ঠিকই, ইতিহাসকে অবলম্বন করে ইতিহাস তৈরি করাই তার লক্ষ্য। বনভূমি হয়ে যাওয়া চম্পা দ্বীপে সুশীল সনৎ আর জামাতুল্লা খুঁজে পায় একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ। সেই রহস্যময় এলাকায় এক অপরূপ নর্তকী, ঘূর্ণ্যমান, যেন স্মিতহাস্যে আগন্তুক অভিযাত্রীকে অতীত গৌরব, বর্তমান দুর্ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের তর্জনীর ইশারা তার। সুশীল সনৎ খুঁজে পায় সেই রহস্য দ্বার। সেই কক্ষে পড়ে আছে কঙ্কাল! ব্যর্থ অভিযাত্রীর অনিবার্য পরিণতি।

আগেরদিন তেলুগু নাবিকদের ভাষায় 'বিম্ভুমুনি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় স্বপ্নে। সুশীলের সঙ্গে সেই বিম্ভুমুনি বা ব্রহ্মদৈত্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখকের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিন্ধুমুনির (ভুল করে ছাপা হয়েছে হতো 'বিম্ভমুনি' ---অ.বি.) দেশে জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে এক দুঃস্বপ্ন দেখেছিল সুশীল। ....প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আত্মা এসে যেন ডাক দিয়েছে সুশীলকে'। এই স্বপ্নযাত্রার একটু শোনাই। এখনকার উত্তরাধুনিক সাহিত্যের জাদুবাস্তবতা (Magic Realism)-র ঢং এতদিন আগে বিভূতিভূষণ আয়ত্ত করলেন কীভাবে? আশ্চর্য লাগে আমাদের।

'গভীর অন্ধকারের মধ্যে এক দীর্ঘাকৃতি পুরুষ' সুশীলকে বলেছেন 'আমার সঙ্গে আয়।' সবাই আচ্ছন্ন। 'সারি সারি প্রাসাদ একদিকে, অন্যদিকে প্রশস্ত দীর্ঘীকার টলটলে নির্মল জলরাশির বুকে পদ্ম ফুটে আছে। 'সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে দেউলে দেউলে ত্রিমূর্তি মহাদেবের পূজা হচ্ছে।' সুশীল দেখে 'সুগন্ধ দীপবর্তিকার আলোকে' মন্দির উজ্জ্বল। 'বাতায়ন বলভিতে' শুকশারী। সুশীল জানতে চাইল, 'আমায় কোথা নিয়ে যাবেন?' সেই দীর্ঘকায় পুরুষ বললেন 'সে কথা বলব না। ভয় পাবি'---। তবু শুনতে চায় সুশীল। পুরুষ বললেন, 'সমুদ্রমেখলা এ দ্বীপের বহু শতাব্দীর গুপ্ত কথা ঘন বন ঢেকে রেখেছিল। ভারত মহাসমুদ্র স্বয়ং এর প্রহরী, দেখতে পাও না?'

এই আশ্চর্য সংলাপ প্রাচীন গৌরবময় ভারতের সঙ্গে আজকের মুসলমান তাড়িত, ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসিত ক্ষীণদৃষ্টি ভীরু কেরানি বৃত্তিধারী বঙ্গীয় তরুণের সঙ্গে।

ভারত মহাসমুদ্র আমাদের ভাগ্যবিধাতা। ভারতের গৌরব উত্তরে হিমালয় সন্নিহিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রেশম পথ আর দক্ষিণে আরব সাগর বঙ্গোপাসাগর আর ভারত মহাসাগরের মশলা পথ। যতদিন এই দুই বাণিজ্যপথ আমাদের অধিকারে ছিল, ততদিন ভারতজননীর দিকে কেউ কুদৃষ্টি ফেলতে পারেনি। এই সম্পদই জীবনানন্দ দাশের কল্পনার 'দারুচিনি দ্বীপ' পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। 'হিরে মানিক জ্বলে' তারই এক আশ্চর্য উপন্যাস।

ওই বিরাট পুরুষকে 'বিম্ভুমুনি' বলার ভুল করেননি বিভূতিভূষণ। রবীন্দ্রনাথ সাগরিকায় এই দূর দ্বীপবাসিনীর সামনে গিয়ে বলেছিলেন—দেখোতো মোরে চিনতে পারো কি না!

সুশীল ভাবতে থাকে। সেই বিরাট পুরুষ জানিয়েছেন, 'তুমি ভারতবর্ষের সন্তান, তোমাকে একেবারে বঞ্চিত করব না আমি—রহস্য নিয়ে যাও, অর্থ পাবে না।' তা রহস্য না থাকলে জীবনের অর্থই তো হারায়। বিভূতিভূষণের কিশোর সাহিত্যকে 'অর্ন্তমুখী' বলতে চাননি লীলা মজুমদার। তাঁর চমৎকার ভাষা 'ছোটদের বই হবে জাপানি বাগানের মতো।' অতিরিক্ত কিছু থাকবে না। কিন্তু সুশীলের ভারত-ভাবনা কি অন্তর্মুখী নয়? বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, পাঠক বইখানি পড়বেন---বাড়ির কিশোর কিশোরীদের পড়াবেন। তারা রহস্য থেকে অর্থ তাৎপর্য খুঁজে পাবে।

শেষ করবো সুশীলের অভিযানের সার্থকতা আর ব্যর্থতার সন্ধিপর্বের উপলব্ধির কথা শুনিয়ে। 'ভারত! ভারত! কত মিষ্টি নাম, কী প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্ভার!' তাদের পূর্বপুরুষ বাহুবালে 'কম্পাস-ব্যারোমিটারহীন যুগে সপ্তসমুদ্রে পাড়ি' দিয়ে এই দ্বীপময় ভারতে এসে হিন্দুধর্মের নিদর্শন দেখে গেছেন! পরবর্তী যুগে 'স্মৃতিশাস্ত্রের বুলি আউড়ে' যারা সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করেছিল—আমরা কি তাদের উত্তরাধিকারী! আমার সেই বোন সুপ্রীতি কি এমনই কোনো নির্মাণ দেখে এসেছে? হয়তো গড়ের মাঠে এক চতুর জাহাজি সুশীলের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেছিল—মাচিস আছে? মাচিস? দেশলাই। দীপশলাকা। সুশীল ধূমপান করত না—তার কাছে মাচিস ছিল না। কিন্তু হৃদয়ে ছিল দীপশলাকা—তা না জ্বললে কি বৃহত্তর মহতোমহীয়ান ভারতকে চেনা যায়!

আরণ্যকের সত্যচরণের মধ্যে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-জীবনের সন্ধান

অভিমন্যু গুহ

বিভূতিভূষণের জীবন জুড়ে প্রকৃতি ধরা দিয়েছে নানা রূপে। যখন তিনি নৈহাটির অপর পাড়ে প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় পড়তে যেতেন, তখন বালক বিভূতিভূষণ প্রকৃতির রূপ সম্ভোগ করেছেন, পথের পাঁচালীর অপুর মধ্যে সেই প্রমাণ রয়েছে। জন্ম হয়েছিল বনগ্রামে। বাবা মহানন্দ ছিলেন স্বভাব গায়ক। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় মহানন্দ তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরতেন, প্রকৃতি-মানুষে মোহিত হয়ে সেই রস উপভোগ করত। বিভূতিভূষণের শৈশবে সেই প্রকৃতির রস অসামান্যভাবে তাঁর মধ্যে প্রকাশ করেছিল। প্রকৃতির পাশাপাশি তিনি মানুষ দেখেছিলেন। শৈশব-বাল্যের স্মৃতিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেখার অবকাশ তাঁর কাছে অবশ্যই ছিল। তবে উপাদানের প্রাচুর্য ছিল না। তার সুযোগ হলো কর্মজীবনে পরিপূর্ণ প্রবেশের মধ্যে দিয়ে, ভাগলপুরে। বিভূতিভূষণ পাথুরেঘাটা ঘোষদের জমিদারি ভাগলপুরের এস্টেটের ম্যানেজারি করেছেন ছ' বছর, ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত। এই সময়কাল লেখক বিভূতিভূষণকে পাবার সময়।

এই পর্বেই তিনি গড়ে তোলেন তাঁর আরণ্যক উপন্যাসের পটভূমি। পথের পাঁচালীর অপুর মধ্যে যেমন বিভূতিভূষণের ছায়া পাওয়া যায়, তেমনি আরণ্যকের সত্যচরণ যে আসলে বিভূতিভূষণ তাতে সন্দেহের তিলমাত্র নেই। সেই অর্থে আরণ্যক-কে বিভূতিভূষণের আত্মজৈবনিক পর্ব বলা চলে। ১৯২৪ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত তাঁর ভাগলপুর বাসকালীন অভিজ্ঞতা। যদিও আরণ্যকের রচনা কাল আরও কিছু পরে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আরণ্যক। ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইসমাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের প্রান্তসীমা প্রভৃতি স্থানের বর্ণনা এসেছে। সেই বর্ণনা কেবল প্রকৃতিরই নয়, এলাকার অধিবাসীদেরও। 'আত্মজীবন'-এর দর্পণে আমরা দেখি বিভূতিভূষণ লিখেছেন : 'কলিকাতা শহরের হৈচৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধূধূ ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়হীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙিন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোনো অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের দোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।'

কলকাতায় ছাত্রজীবন আর তার পরবর্তী

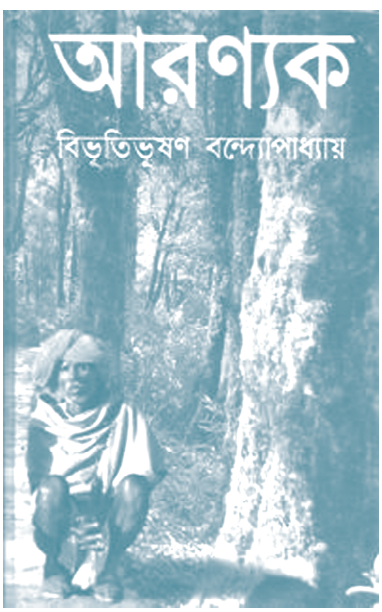

কর্মজীবনের ইট, কাঠ, পাথরের ঘেরাটোপের বাইরে প্রকৃতি সৌন্দর্যের অপরিমেয়তা তাঁকে মুগ্ধ করতেই পারে, আর যেমন বাকি পাঁচটা মানুষকে করে। সেই নির্জন, বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি কখনও কখনও তাঁর বুকে হাহাকার জাগিয়েছে, একঘেয়েমিতে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন, বারে বারে মনে হয়েছে ছেড়েছুড়ে পালাই। সবই সত্যচরণের জবানে আমরা পেয়েছি। নিজের মনকে তিনি সত্যচরণের নামের আশ্রয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই সত্যচরণ বলছেন : 'শুধু বনপ্রান্তর নয়, কতধরনের মানুষ দেখিয়াছিলাম।'

রাজু পাঁড়ে, ধাতুরিয়া, ঠাওতাল সাহু, মটুকনাথ পাঁড়ে, যুগলপ্রসাদ, বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, মুসম্মত কুন্তা, মঞ্চী, রাজা দোবরু পান্না, রাজকুমারী ভানুমতী, মুশ্বের সিও, রাসবিহারী সিংহ, নন্দলাল ওঝা প্রমুখ যে সব চরিত্রের জন্ম দিয়েছেন বিভূতিভূষণ, তাদের নামগুলির অদল-বদল হতে পারে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে এই চরিত্রগুলি নিশ্চয়ই সাযুজ্যপূর্ণ। তাঁর আরণ্যকের গদ্যে সত্যচরণ কথোক্ত নায়ক সবাই, আর নায়িকা প্রকৃতিদেবী। খলনায়ক অবশ্য দু'জন আছে— রাসবিহারী ও নন্দলাল।

সত্যচরণের একটি চরম আক্ষেপের কথা বলতেই হয়। জমিদারি সামলাতে গিয়ে এমন অনেক সিদ্ধান্ত নিতে হয়, পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় যা হয়তো সর্বদা প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারে না। বিভূতিভূষণের জীবনের এই আক্ষেপের ছায়া পড়েছিল, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তা ধরা দিয়েছে। সত্যচরণও কষ্ট পেয়েছিলেন তাঁর নানাবিধ

সিদ্ধান্ত প্রকৃতি-সত্তাকে লাঞ্ছিত করেছে, কিন্তু সেই অসহায়তা ব্যক্ত করে যেতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেননি। আসলে প্রকৃতির মাঝে মানুষের যাযাবরত্বকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ঘর বাঁধার স্বপ্ন মানবের শাশ্বত চেতনা। কিন্তু শহুরে মানুষ আর জঙ্গুলে মানুষের প্রকৃতি ভেদে এই চেতনারও যে পরিবর্তন ঘটে সত্যচরণ তাঁর জবানিতে এই বিস্ময় উপলব্ধি করেছেন।

শহরের জীবনযাত্রার বাইরে জঙ্গলের রূপ-কল্পে জনজাতি জীবনের প্রাত্যহিকতা, সেখানে ঘর-বাঁধার স্বপ্ন আছে। তবে সেই বন্ধন প্রকৃতির রোরুদ্যমানতাকে অতিক্রম করে নয়, 'নীড় ছোটো ক্ষতি নেই, আকাশ তো বড়ো'র সীমায়িত সংজ্ঞাও সেখানে বদলে যায়, গোটা প্রকৃতি তখন সেই মানুষগুলির কাছে 'গৃহ' রূপে ধরা দেয়। কোনও সীমায়িত আবাসস্থল তাদের 'বাড়ি'কে সংজ্ঞায়িত করতে পারে না। এখানেই বিভূতিভূষণ আরণ্যক উপন্যাসে তাঁর অনন্যতা দেখিয়েছেন। 'পথের পাঁচালী'তে অপু যেমন তার শৈশবের প্রকৃতিকে লক্ষ্য করেছিল অপার বিস্ময় আর মুগ্ধতা নিয়ে, বিভূতিভূষণের আরণ্যক শুধু এতেই আটকে থাকেনি, জগৎ-মানবের সবচেয়ে দরকারি আঙ্গিক তার অর্থনৈতিক বিষয়টিকেও স্বতন্ত্র রূপে প্রতিভাত করেছিল, বর্তমান প্রাসঙ্গিকতায় এর গুরুত্বও অনস্বীকার্য। অপুর প্রকৃতি-দর্শন আর সত্যচরণের প্রকৃতি-দর্শনে অবশ্যই 'প্রকৃতি'গত ফারাক আছে, বয়সগত পার্থক্য আছে, কালের সীমারেখা তো আছেই। বিভূতিভূষণের আরণ্যক অবশ্যই আরও একটা কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ, আজকের কালের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিষয়টি হচ্ছে বন্যপ্রাণ। মানুষ আর প্রকৃতির যে মেলবন্ধন, নৈকট্য তাতে বন্যপ্রাণের অবদান খুব বেশি। অরণ্যের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে যে মানসিক নিবিড়তা বিভূতিভূষণ উপলব্ধি করেছেন, তার বাঙ্ময়-ভাব তাকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু যে আবাঙ্ময়তা নিয়েও তিনি প্রকৃতির সান্নিধ্য আরও গভীরতর ভাবে অনুভব করেছেন, তার মূলে আছে তাঁর বন্য হরিণ-সহ অন্যান্য

পশু-পক্ষীর আচমকা সাক্ষাৎ পাওয়া। প্রকৃতির এহেন অবাঙ্ময় সান্নিধ্য তাঁর কাছে কতটা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল তার নমুনা পাওয়া যায় এই লেখাতে— 'তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দুর শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোনো দিকে— কুণ্ডীর জলচর পাখির দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে— একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখি তীরবর্তী এক উঁচু বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।'

প্রকৃতির নিবিড়তা, সান্নিধ্য এভাবেই মানুষ আর বন্য প্রাণের সমারোহ লক্ষ্য করেছেন সত্যচরণ। বালক অপুর দৃষ্টি তাকে পরিপূর্ণতা শিখিয়েছিল কোনও সন্দেহ নেই, বালকত্বে উপলব্ধির বোধ অপরিণত থাকে, যৌবনের দ্বারপ্রান্তে অরণ্যের প্রকাশে সেই উপলব্ধির বোধকে পরিপূর্ণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ, কথা বলা, বোঝা আর না বোঝার চেতনায় চরিত্ররা ভিড় করে এসেছিল স্বতন্ত্র, পূজার বাহনে পবিত্র। বিভূতিভূষণের আরণ্যক সেই উপলব্ধি, আদর্শ, চেতনাকেই পরিস্ফুটিত করে। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

চিঠিপত্র

সঠিক পদক্ষেপ ও সঠিক কথা

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত নরেন্দ্র মোদীর ৩৭০ ধারা থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপকে সঠিক এবং যথাযথ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকেও প্রকারান্তরে ছিল সম্পূর্ণভাবে আলাদা। কাশ্মীরিরা ভারতের যে কোনো স্থানে জমি কেনা, ব্যবসা করা, সবকিছুই অবাধে করতে পারতো। কিন্তু ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষ কাশ্মীরে তা করতে পারত না। এর ফলে একটা জিনিসই খুব ভালোভাবে চলতো সেটা এইরকম, কাশ্মীরি হিন্দুরা ছিল সবচেয়ে বেশি কোণঠাসা। তারা সবকিছুতে ছিল বঞ্চিত এবং অবহেলিত। কাশ্মীরের জন্য যে রক্ষাকবচ ছিল সেটার বিনিময়ে কাশ্মীরি মুসলমানেরা নিজেদের ভারতীয় বলে ভাবতো না। নরেন্দ্র মোদীর জন্য এই সর্বনাশা রক্ষাকবচের পরিবর্তন হলো। এখন কাশ্মীরিরা বিশেষভাবে কাশ্মীরের মুসলমানেরা নিজেদের ভারতীয় ভাবতে শুরু করেছে। ভাগবতজীর কথায় ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা এক সময় হিন্দু ছিল। এ কথা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু ভারতেই নয়, এমনকী আরব ভূমিতেও যারা বসবাস করে তারা সবাই ধর্মান্তরিত মুসলমান। ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা ছাড়া যারা শিক্ষিত এবং জ্ঞানী তারা সবাই এক বাক্যে এ কথা স্বীকার করবে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর কাশ্মীরের এক মুসলমান মৌলবি বলেছে কাশ্মীর ছিল হিন্দু ভূমি, এখানকার বসবাসকারী সবাই ছিল হিন্দু। এছাড়াও আরেকটি কথা সবাই জানে, ভারত থেকে যেসব ধর্মান্তরিত মুসলমানরা আরব ভূমিতে কাবা দর্শনে যান, ওখানকার ধর্মগুরুরা সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে কে কোথা থেকে এসেছে তার হিসাব নেয়। তখন জাপান থেকে কোনো মুসলমান গেলে তাকে বলা হয় জাপানিজ, চীন থেকে গেলে বলা হয় চাইনিজ, ভারত থেকে গেলে তাকে বলা হয় ভারতীয়, হিন্দু বা হিন্দুস্থানী। এইভাবে হিসেব করা হয়। আরবের লোকেরা কিন্তু ভারতের লোককে হিন্দুই ভাবে। একথা সবাই স্বীকার করবে হিন্দু জাতি সব জাতির মা। সব কথাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু ইতিহাসকে উড়নো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমি বলব ভাগবতজীর কথাকে কেউ যদি বলে আর এস এসের মনগড়া এবং সাজানো, তবে আমি তাকে বলব সে পৃথিবীর বাইরের কোনো দ্বীপে অবস্থান করছে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

বাংলাভাষা অবলুপ্তির পথে!

মহামতি গোখেল একবার বলেছিলেন 'What Bengal thinks today, India will think tomorrow' আজ তিনি জীবিত থাকলে উক্তিটি হয়তো প্রত্যাহার করে নিতেন। কারণ বর্তমানে বাঙ্গালিকে আর কেউ অনুকরণ করে না। উপরন্তু বাঙ্গালিই এখন দেশি বিদেশি সবাইকে অনুকরণ করে চলে। বাঙ্গালি এখন আর প্রাতর্ভ্রমণে যায় না মর্নিং ওয়াক করে, প্রাতরাশ করে না ব্রেকফাস্ট খায়, লাঞ্চ বা ডিনার খায়। রিক্সাওয়ালা থেকে সবজিওয়ালা বা উচ্চপদস্থ আমলা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে আর বাংলা বাক্য সম্পূর্ণ করতে পারেন না। বাঙ্গালিরা সকলেই এখন বাচ্চাদের নার্সারি বা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে ভর্তি করাতে আগ্রহী। তাই বাচ্চারা আজকাল আর ছড়া বা ছোটো কবিতা শেখে না। 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে আমটি আমি খাব পেড়ে' বা 'আমাদের ছোটো নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে' বা 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল কাননে কুসুম কলি সকলই ফুটিল'— বর্তমানে অচল। বাচ্চারা শেখে 'টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল লিটিল স্টার হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর' বা 'জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ টু হিল...' ইত্যাদি। বাচ্চরা গোরু জানে না তবে কাউ জানে, বাঘ জানে না তবে টাইগার জানে, সিংহ কী তা জানে না তবে লায়ন কী তা জানে, আম কী জানে না তবে ম্যাঙ্গো কী তা জানে। পশ্চিমবঙ্গে বাস করা অনেক বাঙ্গালি অভিভাবককে বলতে শুনেছি 'ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তো তাই বাংলাটা ওর তেমন আসে না।' বাঙ্গালি হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বাস করে বাংলা না জানাটা যেন গর্বের বিষয়। এরা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে ইংরেজিতেই। বাড়িতে মা হয়েছে মম্, বাবা হয়েছে ড্যাড্ আর সবাই আঙ্কেল বা আন্টি। এরা বাঙ্গালি খাবার পছন্দ করে না, রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া এদের না পসন্দ। তবে ফুচকা, ভেলপুরি, দহিবড়া, ধোকলা চকোলেট, আইসক্রিম, নুডুল্ মোমো বিরিয়ানি ইত্যাদি খুবই পছন্দের। যে কোনও অনুষ্ঠানে সে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিয়েবাড়ি বা জাতীয় দিবস উদযাপন লাউড স্পিকারে উচ্চগ্রামে হিন্দি সিনেমার হিট গান অবশ্যই চাই না হলে প্রেস্টিজ থাকবে না।

একটা টিভি চ্যানেল একটা গানের প্রতিযোগিতায় দেখা গেল প্রতিযোগীরা প্রায় সকলেই হিন্দি সিনেমার হিট গান গাইছে। বাংলা গান প্রায় ব্রাত্য বলা চলে। এক সময় বলা হতো ভারতে ফুটবলের পীঠস্থান কলকাতা। বর্তমানে কলকাতায় ফুটবল খেলা হয় বটে তবে খেলোয়াররা সবাই নাইজেরিয়ান, স্প্যানিশ, ব্রাজিলিয়ান বা জাপানি। বাঙ্গালিরা এখন অন্যের অনুকরণে ক্রিকেট নিয়ে মেতেছে। কারণ হয়তো একবার ক্রিকেটার হিসেবে নাম করতে পারলে কোটি কোটি টাকা রোজগারের সম্ভাবনা। আরও একটি বিষয় আমাকে ভীষণভাবে পীড়িত করে। একটি বাংলা টিভি চ্যানেলে বাঙ্গালি বা হিন্দু সমাজকে হেয় করা হচ্ছে, শ্রদ্ধেয় বক্তাদের মুখ দিয়ে অসত্য বা অশালীন কথা বলানো হচ্ছে, যে সমস্ত উক্তি ওই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা কখনই করেননি। এসব নিয়ে বাঙ্গালিদের কোনও চিত্তবৈকল্য নেই।

তারা মহানন্দে সেগুলি উপভোগ করছে। কোনও কোনও সিরিয়ালে হিন্দুদের খল, কপট মিথ্যাচারী হিসেবে দেখানো হচ্ছে আর অন্য একটি সম্প্রদায়কে উদর, সত্যবাদী, দয়ালু হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে। এসব নিয়ে বাঙ্গালিরা মাথা ঘামায় না। তারা বিনোদন নিয়েই ব্যস্ত। আজকাল শহরাঞ্চলে প্রায় সব বাড়িতে গেটে বা দরজায় নামের ফলক লাগানো থাকে। প্রায় সব বাঙ্গালি বড়িতেই ইংরেজি নেমপ্লেট, সম্ভবত আভিজাত্য প্রদর্শনের জন্য। বহু ইংরেজি শব্দ তো আজকাল পাকাপাকিভাবে পশ্চিমবঙ্গে স্থান করে নিয়েছে। কাপ, প্লেট, টেবিল, চেয়ার, রবার, বোর্ড এগুলো তো এখন বাংলা শব্দ হয়ে গেছে। মনে হয় অতি শীঘ্রই পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলাভাষার অবলুপ্তি ঘটবে।

—শুভব্রত বন্দ্যোপধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর-৭১২১৩৬।

হিন্দিই যোগাযোগের সহজ মাধ্যম

দুশো বছর ইংরেজ ভারত শাসনের ফলে, ইংরেজি ভাষা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। এখনও পাকাপোক্ত ভাবে বসেই আছে। আমরা সরকারি এবং বেসরকারি দপ্তরে ইংরেজিতেই কাজ করে থাকি। ছেলে-মেয়েদের ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করে, ইংরেজিতে পোক্ত করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের জনপ্রতিনিধি পার্লামেন্টে যখন বক্তব্য রাখেন তখন ইংরেজিতেই বলেন দেখে মনে হয় কোনও বিদেশি পার্লামেন্ট। ইংরেজি না জানলে তাকে শিক্ষিত বলে গণ্য করা হয় না। ইংরেজিই বর্তমানে শিক্ষার মাপকাঠি, এত ইংরেজি চর্চা হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের মাতৃ ভাষা ভুলে যাইনি। ভোলা সম্ভব? 'মাতৃদুগ্ধ ও মাতৃভাষা' নাই তার বিকল্প।

আমরা যারা চিকিৎসার জন্য চেন্নাই, ভেলোর যাই, সেখানে তাদের ভাষা আমরা বুঝতে পারি না। ওরাও বাংলা ভাষা দূরের কথা হিন্দিতেও কথা বলতে চায় না। হিন্দি ভাষার প্রতি তাদের অনাগ্রহ কেন? ওরা ওদের দ্বিতীয় মাতৃভাষা ইংরেজিতেই কথা বলতে ভালোবাসেন, বলেও থাকেন। আমরা যারা ইংরেজিতে পটু নয়, তাদের কাছে হিন্দিই একমাত্র বিকল্প। হিন্দিতে দক্ষিণ ভারত ছাড়া সমগ্র ভারতেই কথা বলা বা মনের ভাব প্রকাশ করা সহজ হয়। অসমে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, মাতৃভাষা অসমিয়ার সঙ্গে হিন্দিতেও কথা বলেন এবং বোঝেন। আমরাও অসমিয়া ভাষায় কথা বলতে পারি না। হিন্দিতেই বলতে হয়। সমগ্র পূর্ব-ভারতে হিন্দিতে কথা বলেই মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন হয় না। দক্ষিণ ভারতীয়দের হিন্দি ভাষা শিখলে বা বললে নিজের ভাষা বিলুপ্ত হবে, এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং শিখলে, অদক্ষিণীয় ভাষীদের সঙ্গে হিন্দিতে ভাবের আদান প্রদান করা খুব সহজ হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব রাষ্ট্র ভাষা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঘোষণা সঠিক। হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার কথা আসছে কেন? অমিত শাহ একথা বলেননি যে— মাতৃভাষা বাদ দিয়ে হিন্দিভাষা শিখতে। মাতৃভাষা চর্চার সঙ্গে ভারতীয়রা যে কোনো ভাষাচর্চা বা শিক্ষা গ্রহণ করলে ক্ষতি কী? মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখলে মাতৃভাষা বিলুপ্ত হবে এ ধরণা কেন আসছে? তাই যদি হতো তবে দক্ষিণ ভারতের অনেক প্রদেশের মাতৃভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেত। তা কিন্তু হয়নি। ইংরেজি ভাষা অধিক চর্চা করা সত্ত্বেও।

হিন্দি ভাষা শিখলে বা চর্চা করলে মাতৃভাষা যদি হারিয়েই যেত তবে মাতৃভাষায় এত পত্রপত্রিকা, কবিতা গল্পের বই প্রকাশিত হতো না। দক্ষিণ ভারত ছাড়া গোটা ভারতেই হিন্দিতে কথা বলা হয়। অহিন্দি ভাষীদের বিশেষ করে আমরা বাঙ্গালিরা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেড়াতে যাই তখন হিন্দিতেই মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। ইংরেজির প্রয়োজন হয় না। দক্ষিণ ভারতছাড়া। মাতৃ ভাষার সঙ্গে যে কোনো ভারতীয় ভাষা যে কেউ শিখতে পারে, তাতে মাতৃভাষা বিলুপ্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং ভাষাজ্ঞান বাড়বে। তাই, গেল, গেল রব তুলে অযথা জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রয়াস থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা সুবিধা ভোগী, ছিদ্র পেলেই মাথা গলিয়ে অযথা গেল গেল রব তোলে রাজনৈতিক মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে, সেই সঙ্গে পশিচমবঙ্গের কলকাতাকেন্দ্রিক তথাকথিত বিদ্বজ্জনরাও রাজনৈতিক নেতাদের সুরে তাল মিলিয়ে গোঁ ধরেন। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরও ইংরেজি ভাষা আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে, তাতে কি আমরা মাতৃভাষা ভুলে গেছি? কাজেই গেল গেল রব থেকে বিরত থেকে অমিত শাহের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

—অনিল চন্দ্র দেবশর্মা,
দেবীবাড়ি, নতুনবাড়া, কোচবিহার।

নোবেল ও বাঙ্গালির কাঙালপনা

অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। সুতরাং বাঙ্গালি উল্লসিত। পশ্চিমি দুনিয়া একবার পিঠ চাপড়ে দিলে বাঙ্গালি বরাবরই পুলকিত বোধ করে। এর আগে অমর্ত্য সেনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা দেখা গেছে। প্রশ্ন হলো, বাঙ্গালি কবে ঔপনিবেশিক মায়াজাল ছিন্ন করে বাইরে বেরোবে? ভারতের অন্য কোনও প্রদেশের মানুষের এই কাঙালপনা নেই। অথচ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি স্বাধীনতার এত বছর পরেও ব্রিটিশ পিছুটান থেকে মুক্ত নয়।

—নবারুণ সেনগুপ্ত,
বিরাটি।

শোক সংবাদ

বাঁকুড়া নগরের স্বয়ংসেবক তথা পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক স্বরাজ কুমার দাসের সহধর্মিণী নন্দিনী দাস গত ১ জুলাই পরলোকগমন করেন। তিনি তাঁর স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে রেখে গেছেন। উল্লেখ্য,তিনি বাঁকুড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সদস্যা ছিলেন। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের মহিলা সমিতির দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। শিশুকাল থেকে তিনি সঙ্ঘ পরিবেশে বড়ো হয়েছেন। তাঁর বাবা স্বর্গীয় রবীন্দ্র বর্মণ কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে সঙ্ঘকার্যকর্তা ছিলেন। তাঁর বাড়িতেই একসময় সঙ্ঘ কার্যালয় ছিল। তাঁর মা দুর্গাবাহিনীর দায়িত্ব পালন করেছেন। শ্রীমতী দাসের অকাল প্রয়াণে বাঁকুড়ার স্বয়ংসেবকরা গভীরভাবে শোকাহত।

সমস্তিপুরের মণ্ডপশিল্পী শোভাকুমারী

সুতপা বসাক ভড়

একটি মেয়ে মাটিতে বাঁশ পুঁতে, বাঁশ বেঁধে প্যান্ডাল বানাচ্ছে কিংবা অনুষ্ঠান বাড়িতে লোডশেডিং হলে দৌড়ে এসে জেনারেটার চালু করছে— এমন দৃশ্য আমাদের কাছে খুবই বিরল এবং আশ্চর্যের। অথচ এটি বাস্তব ঘটনা। এমনিতে মহিলারা সব ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করে চলেছে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্র আছে, যেখানে এখনও পর্যন্ত মহিলাদের আমরা দেখতে পাই না। প্যান্ডাল, ডেকোরেটার ইত্যাদির ব্যবস্থা এগুলির মধ্যে অন্যতম। পুরুষেরা এই ব্যবসা সামলায় এমনটাই আমরা দেখতে অভ্যস্ত। এই প্রচলিত রীতি ভেঙেছে বিহারের সমস্তিপুরের শোভাকুমারী।

সে কেবলমাত্র প্যান্ডালের ব্যবসাই করে না, সহযোগীদের সঙ্গে মিলেমিশে প্যান্ডাল বাঁধেও। প্যান্ডাল বাঁধার কাজে সে একজন নিপুণ শিল্পী, বাঁশ পুঁতে, বাঁশ বেঁধে প্যান্ডালের রূপ দেওয়া; তারপর তাতে কাপড় লাগিয়ে সুন্দর সামিয়ানা বানানো এসব অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে শোভাকুমারী করে থাকে। লোডশেডিং বলে মুহূর্তের মধ্যে জেনারেটার চলিয়ে দেয়। সব থেকে বড়ো কথা, ওইসব কাজের মধ্যে সে নিজের বি.এ.-র পড়াশুনাও করছে। ভবিষ্যতে সে তার কর্মক্ষেত্রকে আরও বিকশিত করার জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বা ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়।

আগে শোভাকুমারীর বাবা এই ব্যবসা করতেন। মা ও পাঁচ ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিবারের ভরণপোষণ চলে তার এই ব্যবসা থেকে। পুঁজি বলতে ছিল মাত্র সাত হাজার টাকা, সেজন্য উপার্জনও কম ছিল। মাত্র এগারো বছর বয়স থেকে শোভা নিজের বাবাকে ব্যবসাতে সাহায্য করতে শুরু করে এবং দু'বছরের মধ্যে সে সব কাজ শিখে নেয়। এরপর অসুস্থ বাবাকে আর কাজ করতে না দিয়ে সে নিজেই ব্যবসা চালাতে আরম্ভ করে। বর্তমানে তার এই কুশলতার জন্য তার ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পড়াশুনা এবং বোনেরা স্কুল- কলেজে পড়াশুনা করছে।

শোভা জানায়, সে যখন এই ব্যবসার কাজে যোগ দেয়, তখন গ্রাম এবং আশেপাশের লোকজন তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। তার বাবাকেও অনেক কথা শুনতে হয়েছে, কিন্তু সে এসব কিছু গ্রাহ্য করেনি, সংসারের আর্থিক উন্নতি করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। সেজন্য কোনোরকম লজ্জা-সংকোচ না করে সে কেবলমাত্র নিজের কাজের প্রতি, দায়িত্বের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন এবং প্রথমে কিছু সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে সে তার ব্যবসা সামলায়। শোভার ভালো ব্যবহার এবং কাজের প্রশংসা চারদিকে ছড়িয়ে পরে। তারপর সে আর পেছন ফিরে দেখেনি। তার বানানো প্যান্ডালের চাহিদা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। এখন এটি শোভা টেন্ট হাউস নামেই প্রসিদ্ধ। বর্তমানে তার ব্যবসায় বিনিয়োগ দশ লক্ষ টাকার বেশি। একই সঙ্গে একাধিক ইভেন্ট চালায় সে। এতটাই দক্ষ হয়ে উঠেছে শোভা যে কোনো কর্মী অনুপস্থিত থাকলে, তার কাজটা সে নিজেই করে নেয়। জেলা টেন্ট অ্যান্ড ডেকরেটার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সচিব শ্রীরঞ্জন শর্মার মতে যেসব বাড়িতে মহিলারা কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, তাঁরা কেবলমাত্র শোভাকেই পছন্দ করেন, কারণ এর ফলে তাঁরা তাঁদের বাড়ির অনুষ্ঠানাদি নিজেদের খুশি মতো করে নেন। ওই সংস্থাটি জানিয়েছে যে, আগে এই ব্যবসা একচেটিয়া পুরুষদের হাতেই ছিল, কিন্তু বর্তমানে শোভা সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছে। এই পেশায় বিহারের একমাত্র মহিলা হবার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে শোভাকে সম্মানিত করা হয়েছে। জেলার বিভূতিপুর নিবাসী গোপাল মাহাতোর ঊনিশ বছরের মেয়ে শোভার আজকের এই সফলতার পেছনে আছে সুদীর্ঘ সংঘর্ষময় পথ।

শৈশবেই আশ্চর্যরকমের মমতাময়ী এবং সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছে শোভাকুমারী। নিজের বাবার কষ্ট সে হৃদয় এবং মস্তিষ্ক দিয়ে অনুভব করে লাঘব করেছে। পরিবারকে দিয়েছে সমৃদ্ধি ও গতি। তার এই পথ চলার প্রথমে সে সমাজের ব্যঙ্গের সম্মুখীন হয়েছে, অথচ কিশোরী শোভা সেসব কিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছে। ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু দূরদর্শী পদক্ষেপ তার পথকে মসৃণ করেছে, পরিবারে স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে। মাত্র ঊনিশ বছর বয়সে সে তার কাজের স্বীকৃতিও পেয়েছে। সেজন্য গোপাল মাহাতোর মেয়ে শোভাকুমারী আজ হয়ে উঠেছে বিহারের সমস্তিপুরের শোভা! ▮

আঁচিল ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

আঁচিল হলো একটি স্পর্শক্রামক সংক্রমণ যা শরীরের ত্বকে প্যাপিলোমা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় অথবা সংক্রামক রোগবীজ ঘটিত ব্যাধি যা অতিথির মতো শরীরের চামড়াকে আশ্রয় করে জীবিত থাকে। আবার কিছু রোগ বীজ বা দুষ্টরোগ চামড়াকে সংক্রমণ করে। সাধারণত এদেরকে বলা হয় ভেরুকা বা আঁচিল। এর কারণ অন্তঃত্বক থেকে উদ্ভূত বিনম্র অর্বুদ বিশেষ যা ত্বককে সংক্রমণ করে, মৃদু প্রকৃতির ও বহিঃত্বকে পরিপুষ্ট বা বৃদ্ধি ঘটিয়ে সম্প্রসারিত হয়। এই সংক্রমণটি উপরের ত্বকে সীমাবদ্ধ থাকে এবং স্বয়ং প্রেরণ করে।

সাধারণত শিশুদের বেশি হয়। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্কদের অনাক্রম্যনতা বা বিমুক্তি কম থাকার জন্য আঁচিল ব্যাপক হারে বিস্তৃত হয়ে বেড়ে যায়। এই সংক্রমণটি সর্বত্র বিদ্যমান, সারা পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এই সংক্রমণ রোগটির লক্ষণ প্রকাশের অন্তর্বর্তীকাল হলো প্রায় ৯০ দিনের মতো। এটা শরীরের যে কোনও জায়গায় যে কোনও বয়সে হতে পারে। তবে এই রোগের প্রবণতায় বিভিন্ন ধরনের আঁচিল তৈরি হয়। যেমন প্লেইন, ভালগারিস, ফিলিফরম, প্লান্টার, মোজাইক আঁচিল এবং কনডাইলোমা একুমিনাটাম। আঁচিল খুব ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যমূলক লক্ষণ যুক্ত। আমরা আঁচিল হলে শরীরে যত্নসহকারে পুষে রেখে দিই। সহজে গুরুত্ব দিই না বা চিকিৎসা করাই না যতক্ষণ না বিরক্ত লাগে।

ভেরুকা ভালগারিস : এই আঁচিল খুব সাধারণ ধরনের, চামড়ার মতো রঙ অথবা মাংসের মতো অথবা সামান্য কালচে রঙের হয়। শরীরের উন্মুক্ত জায়গায় বেশি হয়। যদিও দেহ ত্বকের যে কোনও জায়গায় হতে পারে। বেশি হয় হাতে যেমন কনুই থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত। মুখে, পায়ের পাতায়, হাতের নখের চারিদিকে বা নখের ভাঁজে, মাথায় এটি কম হয়ে থাকে। দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার, ছোটোবড় স্ফীতি। মাথার মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে ফুলকপির মতো দেখতে আঁচিলটি হয় এবং তাতে রক্তক্ষরণও হতে পারে। এছাড়া জিহ্বাতে আঁচিল হতে পারে এবং ব্যথা লাগতে পারে।

ভেরুকা প্ল্যানা : শিশুরা এই ধরনের আঁচিলেই সংক্রমিত হয় বেশি। মুখে এবং হাতের পিঠে হয় বেশি। কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত হতে পারে। এই জন্য এই আঁচিলের আকে নাম 'ভেরুকাজুভেনিলিস'। এই আঁচিলগুলি অপচ্যমান ঘনবটি পীড়কা ঠিক চামড় বা ত্বকের রঙের মতো। ত্বকের ওপরের দিকটা সমতল থাকে শুধুমাত্র সামান্য স্ফীতি-যুক্ত এবং ছোটো মসৃণ চ্যাপ্টা ধরনের। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের মুখে একটি সচরাচর দেখা যায়। অনেক সময় আঁচিলগুলি আলপিনের ডগার মতো অথবা ওর চেয়ে একটু বড়ো হতে পারে এবং কয়েক ডজন হতে পারে, আবার ব্যক্তিগতভাবে কারও কারও লাইন দিয়ে হয়।

ভেরুকা ফিলিফরম : অনেকটা আঙুলের মতো (অবিক্ষিপ্ত অঙ্গ) আঁচিলের কোষগুলি সাধারণত ঘাড়ে ও মুখে এবং চোখের চারিদিকে দেখতে পাওয়া যায়। দাঁড়িতে আঁচিলগুলো আঙুলের মতো দেখতে হতে পারে। এটা বাড়ে বা ছড়িয়ে পড়ে বারবার দাড়ি কাটার ফলে।

ভেরুকা প্ল্যান্টার : প্রধানত এই আঁচিলটি একটি করে আলাদা আলাদা হয়। এই আঁচিল ব্যথা-বেদনাযুক্ত ত্বকটি হয় স্থূল প্রকৃতির, গোলাকার ফলকের মতো ইহার ব্যাস প্রায় ১ সেন্টিমিটারের থেকে দেড় সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। এটাকে খুঁটে তুলতে গেলে রক্ত বেরিয়ে যায়। পায়ের তলার এই আঁচিল পিণ্ডটির বাইরের সীমারেখা বহুভুজ আকৃতির এবং এবড়োখেবড়ো উপরের স্তর একে বলা হয় মোজাইক আঁচিল। এই ধরনের আঁচিলের সংক্রমণ ঘটে সাধারণত সুইমিং পুল থেকে পাবলিক বাথরুম ব্যবহারে এবং বীচ থেকে খুব কম সংক্রমণ হয়। এই আঁচিলগুলোর সঙ্গে পায়ের তলায় কড়া পড়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন কড়া উপর চাপ দিলে প্রচণ্ড ব্যথা বা যন্ত্রণা হয় বিকেলের দিকে, কিন্তু আঁচিলের ধারে বা সামান্য উপরে চাপ দিলে ব্যথা বোঝা যায় সকালে অথবা যখন প্রথম শরীরের ওজন পায়ের উপর পড়ে এটাই তফাৎ।

কনডাইলোমা একুমিনাটাম : এটি একটি অতি সাধারণ, অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আঁচিল যা লিঙ্গমুণ্ডে ও লিঙ্গ ত্বকে এবং মলদ্বারের ঠিক বাইরে চর্তুদিকে বেষ্টন করে হয়ে থাকে। কোনও পুরুষ যখন বাছবিচার হীনভাবে যৌন কার্য করে থাকে বারংবার অথবা ভিন্ন জায়গায় যৌনসঙ্গম বা মেলামেশা করলে এই ধরনের আঁচিল হয় অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্কদের। এই আঁচিলটির বৈশিষ্ট্য হলো বৃত্তাকার সংযোগ অংশ যা বহু সংখ্যক বৃত্তাকার উদ্ভিদ অথবা আঁচিল সাদৃশ্য মাংসাঙ্কুর জন্মে। সংক্রমণটি ঘটে যৌনকার্য করার সময়। মহিলাদের যোনিমুখে এই ধরনের আঁচিল হতে পারে এবং আকস্মিক ভাবে আঙুল ব্যবহার করলে। গর্ভবতী মহিলাদের এই ধরনের আঁচিল হলে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রবণতা থাকে এবং প্রসবের সময় প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে।

চিকিৎসা : অনেকেই জানেন বা ধারণা আছে যে আঁচিলের চিকিৎসা মানেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা। একমাত্র হোমিওপ্যাথি ওষুধই পারে অপারেশনবিহীন তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ। শরীরের বিভিন্ন হোমিও ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই রোগটি একটি ভাইরাল ইনফেকশন ঘটিত রোগ। এই রোগ হলেও প্রয়োজন বোধ করলে অবশ্যই যে কোনও অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করুন। আপনি ভালো থাকবেন। ■

আবরার হত্যাকাণ্ড জাতির জন্য লজ্জাজনক

শিতাংশু গুহ

ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যা এক জঘন্য অধ্যায়। পুরো বাংলাদেশ এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার। মানুষ কেঁদেছে। প্রতিবাদ করেছে। নিন্দা করেছে। আমরা ফাহাদকে বাঁচাতে পারিনি। তাঁকে মরতে হয়েছে। মৃত্যুর কাফেলায় যুক্ত হয়েছে আরও একটি নাম। এই হত্যার নিন্দা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। আমি আবরার হত্যার বিচার চাই না। বিশ্বজিৎ হত্যা বিচারের মতো আবরার হত্যার বিচার নিয়ে 'প্রহসন' হোক, তা চাই না। চাই, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। চাই, আইনকে তার নিজস্ব পথে চলতে দেওয়ার স্বাধীনতা। নিষ্ঠুরতার অনন্য নজির এ হত্যার সংবাদ পড়ার সময় সংবাদ পাঠক (চ্যানেল ২৪'র ফারাবি হাফিজ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। শুনছি, আবরারকে মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে ফেলে রেখে হন্তারকরা ফুটবল খেলা দেখতে গেছে? এ কেমন বর্বরতা? দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, নৈতিকতায় আমরা পিছিয়ে পড়ছি?

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শুধু সরকারের প্রধান হিসেবে নয়, মা হিসেবে আবরার হত্যার বিচার করবো। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতটি খুন হয়। আমরা তখন জগন্নাথ হলে, ঘুম থেকে উঠে এ সংবাদ শুনে হতভম্ব হয়ে যাই। খুনি ছাত্রলিগের শফিউল আলম প্রধান ও অন্যরা। বঙ্গবন্ধু কাউকে ছাড় দেননি। সবার সাজা হয়। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর এদের ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করা হয়, সেটা ভিন্ন ইতিহাস। ২০১৩-তে বুয়েট ছাত্র দ্বীপকে শিবির হত্যা করে। কোনো হৈচৈ হয়নি? কুষ্টিয়ার এসপি এসএম তানভীর আরাফাত বলেছেন, আবরারের পরিবার জামাত-শিবির। তসলিমা নাসরিন লিখেছেন, 'আরবাব অফিসিয়ালি শিবির না করলেও শিবিরের মতো চাল চলন আর চিন্তা ভাবনা। তাতে কী! শিবিরদেরও বাঁচার অধিকার আছে'।

ভিন্নমত প্রকাশের জন্যে জীবন দিতে হয়েছে আবরার ফাহাদ-কে। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। হুমায়ুন আজাদ, রাজীব হায়দার, অভিজিৎ রায়, ওয়াশিকুরবাবু, অনন্ত বিজয় দাস, নীলাদ্রি নিলয়, ফয়সাল আরেফিন দীপন, নাজিমুদ্দিন সামাদ, মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকি, শাজাহান বাচ্চু, জুলহাস মান্নান, মাহবুব তনয়, এরাও নিহত হয়েছেন নির্মমভাবে। ভিন্নমত প্রকাশের জন্যেই তাঁরা মরেছেন। আবরার হত্যা নিয়ে যাঁরা এখন সোচ্চার, মুক্তমনাদের হত্যার পর তাঁরা কি সোচ্চার ছিলেন? যারা এখন বাক-স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তসলিমা নাসরিন বা মুক্তমনাদের বাক-স্বাধীনতার পক্ষে কি তখন কথা বলেছেন? আবরার শিবির না হলেও মৌলবাদী ঘরানার লোক। এজন্য মৌলবাদীরা সোচ্চার। এরা মুক্তমনাদের হত্যায় চুপ ছিল। সমস্যাটা এই জায়গায়। একটি হত্যায় আপনি খুশি, অন্যটিতে বেজার, তা হয় না। হত্যা, হত্যাই। প্রতিটি হত্যা নিন্দনীয়। এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপক প্রতিবাদ একটি শুভ লক্ষণ। কিন্তু সবার কি প্রতিবাদ করার নৈতিক অধিকার আছে? যাঁরা মুক্তবুদ্ধির মানুষগুলোকে হত্যার পর চুপ ছিলেন, তাদের কি অধিকার আছে প্রতিবাদ করার? মুক্তচিন্তক তরুণরা তো কেউ আবরারের চাইতে কম মেধাবী ছিলেন না? আবরারের ক্ষেত্রে বেশি প্রতিবাদ হচ্ছে, প্রগতিশীলরা প্রতিবাদ করছেন, একই

সঙ্গে মৌলবাদীরা প্রতিবাদ করছেন। আবরারের লাশ ব্যবহার করে ভারত বিরোধী ঝান্ডা তুলে মৌলবাদী গোষ্ঠী পুরাতন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। দেশকে অস্থিতিশীল করার এই অপপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে বটে। মৌলবাদীদের যাঁরা এখন প্রতিবাদে মাঠে নেমেছেন, তাদের এই 'সিলেকটিভ মানবতা' একটি দেশ ও সমাজের জন্যে ক্ষতিকর। আববার হত্যাকাণ্ডে ভারত বিরোধিতার ঝড় বইছে। যে কারো ভারত বিরোধিতার অধিকার আছে? কিন্তু সেই বিরোধিতা যখন সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গেল থেকে হয়, সমস্যা সেখানে। বাংলাদেশ-ভারত দুই দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। চুক্তির ভেতর-বাহির কেউ জানে না, কিন্তু 'চিলে কান নিয়ে গেল' বলে সবাই চিলের পেছনে ছুটছেন?

মৌলবাদীরা এখন সোচ্চার, কারণ ক্ষমতায় আওয়ামি লিগ, এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা? ওঁরা আবরার হত্যাকাণ্ডকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সামাজিক মাধ্যমে এঁরা দ্রুত ছড়িয়ে দেয় যে, অনিক সরকার ও অমিত সাহার নেতৃত্বে এই হত্যাকাণ্ড। অনিক, অমিত, শিবসেনা, আর এস এস, ইস্কন ইত্যাদি। পরে জানা গেল, অনিক সরকার হিন্দু নন, মুহম্মদ অনিক। তাঁরা কিছুটা পিছু হটলো। শুরু হলো অমিত সাহার বিরুদ্ধে প্রচারণা। মৌলবাদীদের চাপে অমিত সাহা গ্রেপ্তার হলেন। ঘটনার দিন অমিত সাহা হলে ছিলেন না। সিসিটিভি ফুটেজে তিনি নেই। এজাহারে নাম নেই। তার বন্ধু ফাহিম বলেছেন, অমিত তার বন্ধুর বাসায় ছিলেন। ফাহিম বলেন, সমস্যা হচ্ছে, অমিত হিন্দু, তাঁকে ব্লেম দেওয়া হচ্ছে। অমিতের বন্ধু আবীর বলেছে, অমিত তাদের বাসায় ছিল।

নয়া দিগন্ত, চ্যানেল আই, এনটিভি অমিতের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছে। অমিত দোষী হলে তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। তাঁর রুমে আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওই কক্ষে ৪ জন ছাত্র থাকতেন, অন্যদের কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এখন বলা হচ্ছে, আবরারকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনার সময় ছাত্র লিগের আইনবিষয়ক উপসম্পাদক ও পুরকৌশল বিভাগের ছাত্র অমিত সাহা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এজাহারের বাইরেও এ হত্যার ঘটনায় আরো তিনজনের জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা। অমিত সাহা বলেছেন, বুয়েটের ট্র্যাডিশনই হচ্ছে উপরের (সিনিয়রদের) অর্ডার এলে তা মানা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। প্রশ্ন হলো,১৯ জন অভিযুক্তের মধ্যে ১ জন হিন্দু হলে এদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণ কী? অভিযুক্ত সনাক্তে ধর্ম সামনে আসবে কেন? খুনির পরিচয় শুধুই খুনি, হিন্দু খুনি, মুসলমান খুনি, আসলো কবে থেকে?

একটি মহল আরবার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে ঘোলা জলে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। গেয়েন্দা সংস্থাগুলো বলছে যে, আবরার হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরপরই বুয়েটে সক্রিয় হিজবুত তাহরীর। নিষিদ্ধ ঘোষিত এই সংগঠনটির প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শক্ত ঘাঁটি রয়েছে বলে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চিত করেছে। এর আগেও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিজবুত তাহরীর সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে একাধিক শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এই মহলটি বলতে চাইছে, আবরার ভারত বিরোধী মন্তব্য করেছে বলে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কোথায় যেন দেখলাম, দেশে এখন ৮০ শতাংশ মানুষ মৌলবাদী ও ভারত বিরোধী। তাই যদি হয়, তাহলে তো ছাত্র লিগকে কোটি কোটি মানুষকে মারতে হবে? ছাত্র লিগ কি মানুষ মারার যন্ত্র? আইসিস যখন বিশ্বব্যাপী মানুষ মারে, তখন আপনারাই তো বলেন, ওঁর প্রকৃত মুসলমান নয়, তাহলে ছাত্র লিগের যাঁরা আবরারকে মেরেছে ওরাও প্রকৃত ছত্রলিগ নয়?

আবার দেখা যাচ্ছে, প্রায় একই সময়ে দুটো খুন। একটি আবরার। অন্যটি ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শাওন ভট্টাচার্য, তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। দুজনই ছাত্র। একজনকে নিয়ে মানুষ প্রতিবাদী। অন্যজনকে নিয়ে টু-শব্দ নেই? শাওনের দুর্ভাগ্য, তিনি ছাত্রলিগের হাতে খুন হননি অথবা তিনি হিন্দু। আচ্ছা, আবরার না হয়ে যদি 'দিলীপ' হতো বা এমনকী, একজন মুক্তমনা 'বোরহান' হতো তাহলে কি প্রতিবাদ হতো? দুটো খুন, পার্থক্য বিস্তর! এটাই বাংলাদেশ। এগারো বছরের স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তির শাসনের সুফল এখন ঘরে ঘরে মৌলবাদ। সুখের বিষয়, দীর্ঘদিন হাইবারনেশনে থেকে উঠে দেশের বুদ্ধিজীবীরা এবার একটি সঠিক বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'কারো মতে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ জিম্মি থাকতে পারে না'। তারা আরও বলেন, ''এক গভীর উৎকণ্ঠা ও অসীম বেদনায় নিমজ্জিত আজ পুরো জাতি। সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাগুলো প্রমাণ করে রাজনৈতিক দলের আদর্শবিহীন দেউলিয়া চরিত্র।''

দৈনিক শিক্ষা নামের একটি পত্রিকা বলেছে, বিবিসি বাংলার ভুল সংবাদই কাল হলো আবরার ফাহাদের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর নিয়ে তথ্য বিকৃত করে ভুল সংবাদ পরিবেশন করে বিবিসি। এই সংবাদের ভিত্তিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে স্টেটাস দেয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ। ক্ষিপ্ত হয়ে আবরারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ ঘটনার পর ছাত্রলিগ নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে। বিবিসির সংবাদের প্রতিক্রিয়াতে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু বলেছেন, ভারতের সঙ্গে গ্যাস রফতানির কোনো চুক্তিই সই হয়নি। যৌথভাবে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের চুক্তি হয়েছে। পত্রিকাটি সত্য বলেছে। বিবিসি বাংলা নিউজ এখন মৌলবাদীদের আখড়ায় পরিণত। ভারতে রাম মন্দির-বাবরি কাণ্ড ভাঙা নিয়ে তৎকালীন ভয়েস অব আমেরিকার (ভোয়া) ঢাকাস্থ প্রতিনিধি গিয়াস কামাল চৌধুরী মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে বলেছিলেন, 'বাবরি মসজিদ ভাঙায় শাঁখারি পট্টিতে হিন্দুরা মিষ্টি বিতরণ করেছে।' এই সংবাদে বাংলাদেশে দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

এবার দেখা যাক, আবরার ফাহাদ আসলে কী লিখেছিলেন, যার জন্যে তাকে মরতে হলো? ৫ অক্টোবর ফেইসবুকে আবরার লিখেন (হুবহু) : (১) ৪৭-এ দেশভাগের পর দেশের পশ্চিমাংশে কোনো সমুদ্রবন্দর ছিল না। তৎকালীন সরকার ৬ মাসের জন্য কলকাতা বন্দর ব্যবহারের জন্য ভারতের কাছে অনুরোধ করল। কিন্তু দাদারা নিজেদের রাস্তা নিজেদের মাপার পরামর্শ দিয়েছিল। বাধ্য হয়ে দুর্ভিক্ষ দমনে উদ্বোধনের আগেই মংলা বন্দর খুলে দেওয়া হয়েছিল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ ইন্ডিয়াকে সে মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্য হাত পাততে হচ্ছে। (২) কাবেরি নদীর পানি ছাড়াছাড়ি নিয়ে কানাড়ি আর তামিলদের কামড়াকামড়ি কয়েক বছর আগে শিরোনাম হয়েছিল। যে দেশের এক রাজ্যই অন্যকে পানি দিতে চাই না সেখানে আমরা বিনিময় ছাড়া দিনে দেড়লাখ কিউবিক মিটার পানি দিব। (৩) কয়েকবছর আগে নিজেদের সম্পদ রক্ষার দোহাই দিয়ে ভারত কয়লা-পাথর রপ্তানি বন্ধ করেছে অথচ আমরা তাদের গ্যাস দিব। যেখানে গ্যাসের অভাবে নিজেদের কারখানা বন্ধ করা লাগে সেখানে নিজের সম্পদ দিয়ে বন্ধুর বাতি জ্বালাব। হয়তো এসুখের খোঁজেই কবি লিখেছেন, ''পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি/ এ জীবন মন সকলি দাও/ তার মতো সুখ কোথও কি আছে/ আপনার কথা ভুলিয়া যাও।''

(লেখক নিউইয়র্ক স্থিত প্রবাসী বাংলাদেশি)

পুজোর ক'দিন বাংলাদেশে

বিজয় আঢ্য

পঞ্চাশের দশকে কলকাতায় দর্জিপাড়ার বাড়ির দোতলাতে বড়দাদুরা থাকতেন। ঠাকুমা তাদের বাঙাল বলতেন। বাঙাল মানে 'কি করতাছিস? কোথা যাস'—এ ধরনের কথা যারা বলে তাদের বুঝতাম। পরে যত বয়স বেড়েছে, পূর্ববঙ্গ, দেশভাগ, পূর্বপাকিস্তান, বাংলাদেশ—শব্দবন্ধগুলির অর্থ স্পষ্ট হয়েছে। ষাটের দশকে শিয়ালদহ সাউথ সেকশন দিয়ে কলকাতায় কলেজে যাতায়াত করেছি, তখন স্টেশন চত্বর জুড়ে শতছিন্ন, নোংরা কাপড় পরা শীর্ণ মানুষগুলিকে দেখেছি; জেনেছি ওরা রিফিউজি, দেশভাগের বলি। ৭১-এ খান সেনাদের নৃশংস অত্যাচার, মুজিবের 'জয়বাংলা' ধ্বনি ও 'আমার সোনার বাংলা' গান—বাংলাদেশ দেখার ইচ্ছেটা তখন থেকেই জাগছিল। যখন শুনতাম, কদিনের মুক্ত সীমান্তের সুযোগে পরিচিত কয়েকজন বাংলাদেশ ঘুরে এসেছে, তখন মনটা খুস খুস করত। সেই অনেকদিন ধরে পুষে রাখা গোপন ইচ্ছেটা পূরণের এবছরে একটা সুযোগ অনেকটা আকস্মিক ভাবেই এসে গেল। মাস তিন-চারেকের মধ্যেই পাসপোর্ট-ভিসা, কোথায় যাবো, কোথায় উঠবো— এসব ব্যবস্থা হয়ে গেল। অতঃপর 'জয় মা বলে ভাসাও তরী' পঞ্চমীর সকালেই বনগাঁ লোকাল ধরে আমরা চার বন্ধু— সুকেশদা, জয়রামদা ও অপূর্বদা রওনা হলাম। হরিদাসপুর সীমান্তে দু'পারের চেকপোস্টের কাজকর্ম সেরে বেনিয়াপোল থেকে বেলা বারোটা নাগাদ বাস ধরে পিরোজপুর। বাসে যতটা পথ এসেছি, চারদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। সত্যিই 'সবুজে সাজানো দেশ' আর অসংখ্য নদীনালা, খালবিল। মাঝে মাঝে গ্রাম। বেশিরভাগ টিনের চালাঘর। সামনের খোলা জায়গায় হাস-মুরগি, গোরু-ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। যশোর, খুলনা, বাগেরহাট পেরিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বাস পৌঁছাল পিরোজপুরের নাজিরহাটে। পিরোজপুর আগেকার বরিশাল জেলারই একটা অংশ। সেখানে নেমে অটোতে যেতে হবে। শ্রীরামকাঠি গ্রামের শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম মঠে। বাসস্ট্যান্ডে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য আশ্রম থেকে কয়েকজন এসেছিলেন।

পঞ্চমীর সন্ধ্যায় মঠের প্রবেশদ্বারে যখন পৌঁছালাম, তখন অতিথি হিসেবে আরতি, শঙ্খ ও উলুধ্বনি এবং মালা পরিয়ে আমাদের বরণ করে নিলেন আশ্রমের মা-বোন ও ভাইয়েরা। পৌঁছানোর মুহূর্তে এরকম আন্তরিক আপ্যায়ন কখনও ভাবিনি। এক অনাস্বাদিত আনন্দে মন ভরে গেল। বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধা সেনানি চিত্ত সুতারের প্রেরণায় তাঁর অনুগামী সুনীল সন্ন্যাসী নিজেদের পৈতৃক তিনবিঘারও বেশি জমিতে এই আশ্রম গড়ে তুলেছেন। বেশ পরিপাটি করে সাজানো এই আশ্রম। মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত খোলা জায়গা— যেখানে সংকীর্তন, ধর্ম বা আলোচনা সভা হয়।

আবাসিকদের থাকার পৃথক ব্যবস্থা।

মা-বোন ও অতিথিদের জন্যও। সবই মাটির ঘর, টিনের চালা। ঘরগুলো সব মাটি থেকে অনেকটা উঁচুতে। আশ্রম গুরু সুনীল সন্ন্যাসীও এরকমই একটি ঘরে থাকেন। শুধু অতিথিদের জন্য থাকার বাড়িটি পাকা। আশ্রমে এখন ১৪-১৫ জন যুবক রয়েছেন। বেশিরভাগই পড়াশোনা করছেন। এক-দুজন বাদ দিলে সবাই অবিবাহিত। গত ৫২ বছর ধরে এই আশ্রম চলছে। এখান থেকে পড়াশোনা করেছেন এমন সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক। সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেও আশ্রমের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক হৃদয়ের। পূজা উপলক্ষ্যে বিশেষত দশমীর দিনে সবাই আসেন। আশ্রমে যেমন সাজানো বাগান, ছোটো ছোটো পুকুর আছে, তেমনি আছে পোষ্য পাঁচ-ছ'টা কুকুর, খরগোশ, পায়রা, রাজহাঁস। এইসব পোষ্যদের দেখার ব্যবস্থা আছে। একটা বাঁধাধরা নিয়মে সারাদিন আশ্রমের কাজ চলে। আশ্রমিকদের উপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আছে। পাঁচ হাজার বছরের হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতির যা আদতে ভারতীয় সংস্কৃতিরই নামান্তর, তারই আদর্শে আশ্রম জীবন পরিচালিত। পুজোর কদিনে সেটা আরও ভালোভাবে অনুভব হলো।

পরেরদিন অর্থাৎ ষষ্ঠীতে চা-পান সেরে আশ্রমকন্যা অমিয়াদি ও অপূর্বদার সঙ্গে ঘুরে দেখলাম। আশ্রমের বেলতলায় ঘটপূজা ও চণ্ডী পাঠ করে দুর্গাপূজার কল্পারম্ভ হলো। এখানে পূজারি ও পাঠক আশ্রমের আবাসিকরাই। প্রত্যেকেরই আশ্রম প্রদত্ত একটা নাম আছে। এদিন সকালে যারা পূজার সঙ্গে যুক্ত, তাদের এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও আর একবার ধুতি ও ফল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো। আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি ও আগামীদিনে কী করার সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে সুনীল সন্ন্যাসী সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বললেন। আরও জানালেন, তাঁর বয়স এখন ৭৫, তাই নতুনদের ওপর তাঁর ভরসা। আশ্রম পরিচালনায় ভারতের হিন্দুদের কাছেও তিনি সাহায্য প্রার্থী। দেখলাম, সারাদিন ধরেই গৈরিক বসন পরিহিত এই প্রবীণ সন্ন্যাসী কোনও না কোনও কাজের তদারকিতে ব্যস্ত। যেটা লক্ষ্য করার মতো, এখানে পূজার মন্ত্র সংস্কৃত নয়— বাংলা, মূল সংস্কৃত গ্রন্থের কাব্যানুবাদ। আমরা শুনছিলাম। কোথাও কোনও তালভঙ্গ হয়নি। মূলানুগ। আর সব থেকে বেশি মন কেড়েছে মন্ত্রের মধ্য দিয়ে তাঁদের আকুতির প্রকাশ। 'মা আমরা দেশহারা, স্বজনহারা, নির্যাতিত, মা-মেয়েরা অরক্ষিত, মা মুখ তুলে চাও, সন্তানদের কৃপা করো, আবার অখণ্ড ভারত হোক।' এই আকুতি, এই মর্মস্পর্শী প্রার্থনা, স্বদেশের অখণ্ডতার জন্য প্রার্থনায় আমাদের চোখও ঝাপসা হয়ে আসছিল। এমন বেদনভরা আর্তি পশ্চিমবঙ্গে দুর্লভ।

শ্রীরামকাঠী বাজারে পুজো দেখতে বেরোলাম। চারটি পুজো হয়েছে। আড়ম্বরের চাকচিক্য নেই— পবিত্রতার স্নিগ্ধতা আছে। স্টিমার ঘাটটাও এক ফাঁকে ঘুরে এলাম। নাম কালীগঙ্গা। বেশ চওড়া। আরও দুটি নদী এসে কালীগঙ্গাতে মিলে বিশাল আকার নিয়েছে। অষ্টমীরদিন সকালে নৌকা করে আশ্রমের লোকেরা নেচে-গেয়ে আনন্দ করে পূজার ঘট ভরে নিয়ে যায়। সেট যেমন দেখার তেমন উপভোগেরও। আমাদের সঙ্গীরা চা খাওয়ার জন্য একটা দোকানে নিয়ে গেলেন। সেখানে আশপাশের কয়েকটি দোকান থেকে কয়েকজন দেখা করতে এলেন। বিভিন্ন গল্প হলো। একটা বইয়ের দোকানে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ দেখে জিজ্ঞাসা করাতে ভালোই বিক্রি হয় বলে মালিক জানালেন। শ্রীরামকাঠি বাজার অবশ্য হিন্দুপ্রধান। বাংলাদেশে হিন্দুরা এখন প্রায় ৯ শতাংশ। দেশভাগের সময় ছিল ২৮ শতাংশ। নিজেদের পৈতৃক ভিটে আঁকড়ে সাহসের সঙ্গে থাকাটাই হলো সেখানকার হিন্দুদের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ। যদিও তারা জানালেন, শিক্ষিত ও ধনী হিন্দুদের মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। সারা বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের অসংখ্য মঠ-মন্দির-আশ্রম রয়েছে। নিত্য পূজা ও নৈমিত্তিক যাগ-যজ্ঞ, ভজন-কীর্তন, পালাগান, শাস্ত্র পাঠ সবই হয়ে থাকে। দিনাজপুর জেলার হিলি থানার সাধুরিয়া গ্রামে শুধু মহিলারা বসে গীতা পাঠ শুনছেন— যিনি পাঠ করছেন, তিনিও মহিলা— এ দৃশ্য তো আমরা নিজের চোখেই দেখলাম। কিন্তু সমন্বয়ের বড়োই অভাব, সবাই বিছিন্ন দ্বীপের মতো অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। সংগঠনই যে হিন্দুদের সব থেকে বড়ো দুর্বলতা, সেকথা এদেশেও যেমন সত্য, সীমান্তের ওপারেও তেমন সত্য। আশার কথা, হিন্দু সংগঠিত হলে কী হতে পারে তার একটা আভাস এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যুবক আশ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প হলো। স্থানীয় বেশ কয়েকজন মানুষ দেখা করতে এলেন। আওয়ামি লিগের প্রাক্তন এমপি-র ভাই জনাব রহিম সাহেবও দেখা করতে এসেছিলেন। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীর

মা চাকেশ্বরী

রমনা কালীমাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূজো।

সম্পর্ক কীভাবে আরও দৃঢ় হয় তা নিয়েও চর্চা হলো।

অষ্টমীর সকালে সুনীল সন্ন্যাসী ও আবাসিকদের সঙ্গে বিদায়পর্ব, আশ্রমের বিশাল বটবৃক্ষ তলে সকলের সঙ্গে ছবি তুলে এবং মন্দিরে গিয়ে মা দুর্গাকে প্রণাম করে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলাম। আমাদের সঙ্গে বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত বিদায় জানাতে এলেন আশ্রমের পরবর্তী প্রধান বিধানদা। নাজিরপুর থেকে গোপালগঞ্জ হয়ে বাস পৌঁছাল পদ্মা নদীর পাড়ে। এখানে নেমে পদ্মা পার হতে হবে। ওপারে এই বাস এজেন্সিরই আর একটি বাস আমাদের নিয়ে যাবে। সব ধরেই টিকিট। ট্রেনের প্লাটফর্মের মতো স্টিমারে ওঠারও বিভিন্ন জেটি। দেখলাম বড়ো বড়ো স্টিমার, ট্রলার, বাস শুদ্ধ একটা বার্জ। বিশাল চওড়া পদ্মা। গঙ্গার মতো ঘোলা জল— আসলে পদ্মাও যে গঙ্গা। সেই ছোটোবেলা থেকে পদ্মা নদীর নাম শুনছি। পদ্মার ইলিশ, গোয়ালন্দের ঘাট, স্টিমারের ভেঁপু, পদ্মার মাঝিমোল্লা— এমনিই সব কত কী! সেই পদ্মা আজ পার হবো। মনে বেশ একটা শিহরণ অনুভব করছি। এখন ভরা পদ্মা। অসংখ্য ছোটো বড়ো জলযান ভেসে আছে। এপার-ওপার, এদিক-ওদিক লঞ্চ যাচ্ছে। ফেরি সার্ভিস বেশ জমজমাট।

পদ্মা পার হতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। সারটা পথই স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে দেখতে এলাম। লঞ্চের হোটেলে আহারের ব্যবস্থা আছে। ঝালমুড়ি, চা বিকেচ্ছে। চা খাওয়া গেল। লঞ্চ চলছে। দূরে পদ্মার উপর ডবল ডেক সেতু তৈরি হচ্ছে— রেল ও সড়ক দুটো পথই হবে। যে স্টিমারে উঠেছি তাতে অবশ্য বেশি ভিড় নেই। লঞ্চ থেকে নামলাম মাওয়া ঘাটে। ঢাকা পৌঁছাতে বেলা দুটো বেজে গেল। সৈদাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএনজি (এখনে অটোকে বলে সিএনজি) ধরে টিকাটুলির হাটখোলা রোডে মহাপ্রকাশ মঠে। শ্রীশ্রী প্রভু জগবন্ধু এখানে পূজিত হন। পরিচয়পত্র দেখাতে আশ্রমের অধ্যক্ষ নীলাদ্রিবন্ধু ব্রহ্মচারী অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আপ্যায়ন করলেন। আশ্রমে সারাদিনই প্রায় হরিসংকীর্তন, নামগান চলছে।

ঢাকায় প্রদীপ্তই আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখাল। সে ডাক্তারি পড়ছে। চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। আমাদের এক বন্ধুর সূত্রে প্রদীপ্তর সঙ্গে পরিচয়। ঢাকায় প্রদীপ্তদের বাড়িও গিয়েছিলাম। কথামতো প্রদীপ্ত ওর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে মঠে এলো। নীলাদ্রিবন্ধুজীর দেওয়া চা পান করে দুর্গা প্রতিমা দর্শনে বেরোলাম। প্রথমে গেলাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ও ভোলাগিরি আশ্রমের পূজামণ্ডপে। সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে। ঢাকায় রামকৃষ্ণ আশ্রমের কথা অনেকবার শুনেছি। এবার দেখলাম। বেশ বড়োসড়ো আশ্রম। আমরা যখন এখানে, ভারতে তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গিয়েছেন। সেইসময়ই ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীজী ঢাকার মিশনে স্বামী বিবেকানন্দের নামাঙ্কিত হলের উদ্বোধন করেছেন। প্রতিমা দর্শন ও ঠাকুর-মা স্বামীজীকে প্রণাম করে ঢাকা মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। তিনি পূর্বপরিচিত। কলকাতায় বিবেকানন্দ পৈতৃক ভিটাতে মিশনের যে কেন্দ্র রয়েছে তিনি তার অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বস্তিকার বহুদিনের পাঠক তিনি। স্বস্তিকা পূজা সংখ্যাটি দিলাম। সেদিন রাতে ও পরের দিন সকালে প্রদীপ্তর সঙ্গে শাঁখারি বাজার, তাঁতিবাজার, নাগিন্দা, স্বামীবাগে ইস্কনের মন্দির, ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনা কালীবাড়ি, হরিচাঁদ ঠাকুরের মন্দির, মা আনন্দময়ীর আশ্রম, খামারবাড়ি, ধানমণ্ডি (বনানি)-র পূজা মণ্ডপে গিয়েছিলাম।

দক্ষিণ ঢাকা পুরনো শহর। রিক্সার দাপট। গলিঘুঁজি দিয়ে, কখনও বা শহরের প্রধান রাস্তা দিয়ে, রিক্সায় বা হেঁটে চলেছি। শাঁখারি ও

তাঁতিবাজারে রাস্তা সরু— উপর মাচা করে প্রতিমা বসানো হয়েছে। তলা দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। রাস্তর দু'পাশে শাঁখার দোকান ছাড়া হবেক কিসিমের দোকানপাট। মনে হচ্ছিল, কলকাতার গঙ্গার ঘাটের দিকে কোনও রাস্তা দিয়ে চলেছি। কিন্তু কলাবাগান, খামারবাড়ি বা ধানমণ্ডির পূজাপ্রাঙ্গণ কলকাতার বড়ো পুজোমণ্ডপগুলির মতোই। ধানমণ্ডীর মণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে। মাইকে মন্ত্র পড়া হচ্ছে। অঞ্জলির ফুল ঝুড়ি করে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করে মা-র চরণে দেওয়া হচ্ছে। সবাইকে প্যাকেটে করে খিচুড়ি প্রসাদ বিলি করা হচ্ছে। আমরাও পেলাম।

ঢাকা শহরে এবারে ২৩৬টা পূজা হচ্ছে। বাংলাদেশে দুর্গাপূজা এবারে হাজার দুয়েক বেড়েছে। মোট সংখ্যা ৩০ হাজারের কাছাকাছি। পূজায় সরকার থেকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ পাহারারও ব্যবস্থা হয়েছে। তবুও বিচ্ছিন্ন ভাবে কয়েকটা জায়গায় মূর্তি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে। পুজোর সরকারি স্লোগান— ধর্ম যার যার/ উৎসব সবার। বাংলাদেশে ঢাকেশ্বরী মন্দির, রমনাকালীবাড়ি, চন্দ্রনাথ ধামের মতো হিন্দু তীর্থগুলিকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। প্রতিমা দর্শনের ফাঁকে দেখেছি ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা আন্দোলনের স্মারক। সেখানে সেদিন (৭ অক্টোবর, ২০১৯) স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকারের দাবিতে জমায়েত হয়েছে। অনেকটা আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের মতো। যারা শুধু অধিকারটাই বোঝে— কর্তব্য নয়।

বাংলাদেশের বেশিরভাগ স্মারক জ্যামিতিক আকারে— কোথাও বৃত্ত, কোথাও বা বিভিন্ন রেখার আকার। অবশ্য মানুষের প্রতিমূর্তি দিয়েও বহু স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক রয়েছে। ঢাকার জিরো পয়েন্ট গোলাকার। সেই কেন্দ্রবিন্দু থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব মাপা হয়। ভাষা স্মারক দেখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল দেখতে গেছি। খানসেনাদের গুলিতে নিহত ছাত্র-অধ্যাপকদের স্মরণে স্মারক তৈরি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকরা নিজেদের রক্ত বিক্রি করে এই স্মারক বানিয়েছে। এখানে ভগবান বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য ও স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি রয়েছে। এই জগন্নাথ হলেও দুর্গা পূজা হচ্ছে। তবে ঢাকার বঙ্গভবন, জে এম সেন হল— এরকম অনেক কিছুই সময়াভাবে দেখা হয়নি।

পরেরদিন সকালে চট্টগ্রামে পৌঁছাতে বেলা বারোটা বেজে গেল। এখানেও কোতোয়ালির (থানা) পাশে নতুন তৈরি মহাউদ্ধারণ মঠে অতিথি হলাম। সেখানকার সভাপতি রাজুগোপাল বণিক সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বিকেলে গেলাম চট্টগ্রামের সমুদ্র সৈকতে বিজয়া দশমীর প্রতিমা নিরঞ্জন দেখতে। মূল শহর থেকে সৈকত প্রায় ২০ কিলোমিটর দূরে। শ'খানেক লরি প্রতিমা নিয়ে জড়ো হয়েছে। সৈকতে আসার পথে নেচে গেয়ে ডিজে বাজিয়ে যুবক-যুবতীদের আসতে দেখেছি। যৌবনের এই উত্তাল তরঙ্গ রুধিবে কে? যৌবন বোধহয় দেশকালের সীমারেখা মানে না। সৈকতে প্রায় লক্ষ লোকের মেলা। হিন্দু-মুসলমান সবাই। মেলাতে যেমন থাকে, এখানেও তেমন নানান সামগ্রীর দোকান। হাওয়ায় বুদবুদ বেরুনোর ফানুস থেকে মোবাইলের সিম--- সবই বিকোচ্ছে। এরই মধ্যে শুনতে পাচ্ছি মেলা কর্তৃপক্ষের নানান ঘোষণা, সতর্কবাণী। আমাদের এখানে যেমন। আমরা যতটা পারি খুঁটিয়ে দেখার সব চেষ্টা করছি। কেননা এমন সুযোগ কবে আবার পাবো তা জানি না। চট্টগ্রামের সমুদ্রে অবশ্য ঢেউ নেই— শান্ত সমুদ্র। বেশ কয়েক শো নানা ধরনের জলযান সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। সৈকতে আসার পথে অনেক স্টিল ফ্যাক্টরি, পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুদাম, বাংলাদেশের নৌ-বাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট দেখলাম। চট্টগ্রামে ৫০ শতাংশ হিন্দু। বাংলাদেশের বোধহয় সবচেয়ে বড়ো শহর। উঁচু উঁচু বাড়ি, হাল ফ্যাশনের নানান দোকান, মল, বাজার, লোকজন ও গাড়ির ভিড়— কলকাতাকে মনে করিয়ে দেয়। কল্যাণপুর-গাবতলি বাসস্ট্যান্ডে উত্তরবঙ্গের বাস ধরতে গিয়ে একই দৃশ্য ঢাকাতেও দেখেছি। বস্তুত সারা বাংলাদেশ জুড়ে হাইওয়ে, বড়ো বড়ো সেতু, হাইরাইজ বিল্ডিং তৈরির যেন ধুম লেগেছে।

বাংলাদেশের অনেক শহর, গ্রাম বা রাস্তাঘাটের নাম এখনও হিন্দুদের নামেই রয়েছে। সৈকত থেকে ফেরার পথে ৫২ পীঠের অন্যতম পীঠ মা চট্টেশ্বরীকে দর্শন করতে গেলাম। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মতো বড়ে মন্দির নয়। রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দির চত্বর। তার উপর মা-র মন্দির। বহুদিন ধরে এই মন্দিরের কথা শুনেছি, আজ দেখলাম। পণ্ডিত দীনদয়ালজীর কথা স্মরণে এলো। এক বৈঠকে বাংলাদেশের তীর্থক্ষেত্রের নাম জিজ্ঞাসা করাতে আমরা পশ্চিমবঙ্গের তীর্থক্ষেত্রগুলির নাম বলেছিলাম। তখন সামান্য ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঢাকেশ্বরী, চট্টেশ্বরী, চন্দ্রনাথ ধাম কী বাঙ্গলার তীর্থক্ষেত্র নয়? আমরা লজ্জায় মুখ নামিয়েছিলাম। আজ কিছুট হলেও সেই লজ্জা মুক্ত হলাম। মা চট্টেশ্বরীর নামে এই জেলার নাম চট্টগ্রাম।

পরদিন সকালে উঠে বেরিয়ে পড়লাম শ্রীচন্দ্রনাথ ধাম দর্শনে। সীতাকুণ্ড হয়ে মন্দিরে উঠার পথ। পাহাড়ের চূড়ায় চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ পথে তোরণ। তাতে লেখা--- 'জাতীয় মহাতীর্থ চন্দ্রনাথ ধাম, সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম'। যাত্রা শুরুর আগে ডাবের জল খাওয়া গেল। পাহাড়ে উঠার জন্য দশ টাকা দিয়ে লাঠি ভাড়া নেওয়া হলো। পথের শুরুতে কয়েক মিটার পথ বাধানো হলেও বাকি পথই খাড়া চড়াই। অনেকটা অমরনাথে পিসুটপের মতো। ফারাক এই— এখানে খাড়া সিঁড়ি আছে, অমরনাথে নেই, পাহাড় ভেঙেই উঠতে হবে। দু'পাশের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, হাজারেরও বেশি খাড়া সিঁড়ি এঁকে বেঁকে উপরে উঠে গেছে। লাঠিতে ভর করে ধীরে ধীরে উঠছি। আকাশে ভগবান ভানুর প্রচণ্ড প্রতাপ। ওই গাছগাছালি ঘেরা জায়গাতেও ঘামছি। বার দশেক বসেছি। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক হলে আবার চলা শুরু করেছি। বেশ কিছু যুবককে দল বেঁধে উঠতে দেখেছি। ট্রেকিংয়ের পক্ষে এটা বেশ ভালো জায়গা। আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন এক সিলেটি পরিবার। স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে নিয়ে তিনি উঠছেন। একটা ঝরনা চোখে পড়ল। জল বেশ ঠাণ্ডা। মাঝে একটা দোকান দেখলাম। ডাব ও জলের বোতলের দোকান। অমরনাথের মতো এখানেও মুসলমানরাই এসবের মালিক।

একটু বসে আবার যখন চলতে শুরু করলাম, তখন এগিয়ে আশপাশে কাউকে দেখতে পেলাম না। এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছি সেখানে পথ দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। একটা ইটের পথ। গাড়ির চাকার ছাপ। যাত্রীদের ফেলে দেওয়া বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট দেখে সেই পথ ধরলাম। প্রায় মাইলখানেক একাকী হেঁটেছি। কেউ কোথাও নেই। চন্দ্রনাথের নাম জপ করতে করতে চলেছি। হঠাৎ দেখি দুজন যুবক সামনের দিকে থেকে আসছে। তারা বললে, আপনি ভুল পথে উল্টো দিকে এসেছেন। কী করব ভাবছি। এমনই সময় একটা অটো আসছে দেখলাম। ওই যুবকরাই আমাকে একরকম ঠেলে অটোতে উঠিয়ে দিল। ড্রাইভার ভাড়া দাবি করলেন। বললাম, আমার কাছে বাংলাদেশি মাত্র তিরিশ টাকা আছে। যাহোক মিনিট পনেরোর মধ্যে যেখান থেকে উল্টো

দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম, সেখানে এসে পৌঁছালাম। দেখি বাঁদিকেই সিঁড়ি উঠে গেছে। মন্দিরের চূড়াও দেখা যাচ্ছে। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। আবার শ' খানেক সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের দুয়ারে। প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগল। পাহাড়ের শীর্ষদেশে চন্দ্রনাথ শিবের মন্দির। মন্দিরে তখনও পূজারি রয়েছেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে তিনি পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ালেন। কথায় কথায় মনের কথা— অখণ্ড ভারত কবে হবে, সে বিষয়ে জানতে চাইলেন। বললেন, এই পাহাড়ই স্বয়ম্ভু শিব চন্দ্রনাথ। মন্দিরের এই বিগ্রহ তাঁর প্রতীক। প্রণাম করে মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে কিছুক্ষণ বসলাম। সামান্য জলযোগও সেরে নিলাম। চারদিকের দৃশ্যগুলিকে ক্যামেরা বন্দি করলাম।

এবার আবার ফেরার পালা। নীচে নামতে হবে। নামার পথটা হলো আলাদা। একটা গুহার মতো আধো অন্ধকার পথ দিয়ে সিঁড়িগুলি নেমে গেছে। একটু গা ছম ছম করে। তবু ধীরে ধীরে নামছিও। কিন্তু হঠাৎ এক পশলা জোর বৃষ্টি হয়ে গেল। অর্থাৎ এবার চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হবে। পাহাড়ি রাস্তা একেবারে পিচ্ছিল হয়ে গেল। পা একটু এদিক ওদিক পড়লেই পঞ্চত্ব প্রাপ্তির বেশি দেরি হবে না। খুব ধীরে সাবধানে একটা একটা করে পা ফেলে নামছি। এক একটা সময় কোথায় পা রাখবো ঠিক করতে পারছি না। তা চন্দ্রনাথ শিবই বোধ হয় জুটিয়ে দিলেন। একদল যুবক নামছিল। তাদেরই একজন বলল, আঙ্কেল, আমার হাতটা ধরুন। সেই-ই হাত ধরে ওই বিপজ্জনক জায়গাটা পার করিয়ে দিল। পেছন থেকে আরও একজন যুবক ধরেছিল। একবার সত্যি সত্যিই পিছলে পড়ে গেলাম। না, লাগেনি। তবে জামা-কাপড় কাদায় একশা হয়ে গেল। নীচে নেমে সীতাকুণ্ডের জলে হাত-পা, জমা-কাপড় ধুলাম। নীচে ভবানী মন্দির দর্শন করে ফের চট্টগ্রামে যখন ফিরলাম তখন প্রায় বেলা তিনটে। ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীরটা একটা বিশ্রাম চাইছে। কিন্তু তা আর হলো না। কথামতো স্বস্তিকার বাংলাদেশের প্রতিনিধি দেখা করতে এলেন। তিনি ঢাকার বাসিন্দা হলেও চট্টগ্রামের পৈতৃক পুজো বাড়িতে এসেছেন। অনেক বিষয় নিয়ে চর্চা হলো। শিলাইদহ ও পতিসরে রবীন্দ্রচর্চার জন্য গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানালেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাস্টারদা সূর্যসেনের জমি-জায়গা শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা কারার জন্য কোনও কোনও মহল চেষ্টা করলে দেশের মানুষই তা

বাংলা হিলির সাধুরিয়া গ্রামে মাতৃমণ্ডলীর গীতাপাঠের আসর।

নাজিরপুরে শ্রীরামকথা আশ্রমে।

রুখে দিয়েছে। সে দেশের আদালতও এই প্রয়াসকে নিন্দা করেছে।

কলকাতার মতো চট্টগ্রামের এক চায়ের দোকানে আমাদের 'ডিপার্টিং টি' স্মরণীয় হয়ে থাকবে বলাতে তিনি হেসে ফেললেন। তবে সারা বাংলাদেশ জুড়ে কথায় কথায় ইংরেজি ভাষা বলার চল নেই। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, গাড়ির নাম ও নম্বর, সরকারি কাগজপত্র সব বাংলা ভাষায়। কিন্তু বাংলাভাষার যে দ্রুত ইসলামিকরণ হচ্ছে, একটু নজর দিলে সেটাও বেশ বোঝা যায়।

এবার ফেরার পালা। হিলি হয়ে ফিরবো। সুকেশদার পৈতৃক ভিটে দিনাজপুর জেলার সাধুরিয়া গ্রামে পৌঁছাতে প্রায় আটটা বেজে গেল। ঢাকা থেকে রাত দশটায় বাস ছেড়েছিল। বাংলাদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামটিতে হিন্দুদের প্রাধান্য। সাদর আপ্যায়ন। সবাই সুকেশদার আত্মীয়। এক বছর বয়সে মায়ের কোলে চেপে এদেশে এসে ষাট বছরে সুকেশদার এই পৈতৃক ভিটেতে পদার্পণ। গ্রামের আত্মীয়দের বাড়িগুলিতে যাওয়া, বাজার ঘোরা, বাজারে আত্মীয়দের দোকানে আড্ডা ও চা খাওয়া হলো। কোজাগরী পূর্ণিমার আগের রাত। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় চারদিক ভরে আছে। তবে কোজাগরীর রাত হিন্দুদের মনে নোয়াখালির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশে বহু ধর্মীয় মঠ-মন্দির, দুর্গাপূজার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবু যেন আতঙ্ক কাটে না। 'ঘর কা মুরগির মতন' মনে হয়। মা দুর্গার কাছে তাই নিজেদের রক্ষার জন্য হিন্দুদের কাতর প্রার্থনা। ভারতের উপর নির্ভরতা। বস্তুত শক্তিশালী ভারতই যে বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষাকবচ— এই অনুভব নিয়েই এবার পুজোয় বাংলাদেশ থেকে ফিরলাম। ■

হাওড়ায় শিবপুরে পঁচাত্তরের সত্যাগ্রহী সম্মেলন

গত ৩১ আগস্ট হাওড়া জেলা ও মহানগরেব সত্যাগ্রহী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া মহানগরের শিবপুরস্থিত কেশব স্মৃতির সভাকক্ষে। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ প্রচারক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সম্পর্ক প্রমুখ গোবিন্দ ঘোষ এবং দক্ষিণবঙ্গের সহপ্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল। উল্লেখ্য, সত্যাগ্রহীরা ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৪৫ বছর পর ৪৩ জন সত্যাগ্রহী মিলিত হন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বর্গগত সত্যাগ্রহী –ঁকেশব চন্দ্র চক্রবর্তী, ঁনারায়ণ চন্দ্র মল্লিক, ঁঅমলেন্দু ভট্টাচার্য, ঁসুকুমার ব্যানার্জি, ঁহনুমানমল বেঙ্গানি, ঁবাসব চক্রবর্তী, ঁরবি রায়, ঁঅরুণ প্রামাণিক, ঁশ্যামচাঁদ মল্লিক, ঁঅসিত

মান্না, ঁসন্ত মান্না, ঁহিমাংশু দিণ্ডা –তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেই অন্ধকারময় দিনগুলির স্মৃতিচারণ করেন সঞ্জিত দে, প্রশান্ত দলুই, সুখদেব মল্লিক, স্বদেশ সিংহরায়, অশোক মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন দে, সম্পদ মণ্ডল, স্বপন মান্না, পঙ্কজ মণ্ডল, তপন কুণ্ডু, কাঞ্চন ভাট্টাচার্য, প্রদীপ মান্না, তন্ময় বসু, রবীন মণ্ডল, তপন ব্যানার্জি, ডাঃ চণ্ডী প্রামাণিক, ডাঃ শম্ভুনাথ ধাড়া প্রমুখ।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৪ আগস্ট বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির ৫৭তম সাধারণ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৬ নং বিধান সরণির সভাকক্ষে। সভায় সমিতির সদস্য ও আমন্ত্রিত সহ ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ জোশী,সহ ক্ষেত্র প্রচারক রমাপদ পাল, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাত প্রমুখ। সভায় বিগত ২০১৮-১৯ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করা হয় এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সুশীল কুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে ২০১৯-২০ সালের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে নতুন কর্মসমিতি গঠন করা হয়।

সভাপতি– অজয় কুমার নন্দী, সহ সভাপতি– জীবনময় বসু ও অরিন্দম সিংহরায়, সম্পাদক–তপন গাঙ্গুলী, সহ সম্পাদক– বিশ্বনাথ নন্দী, সদস্য–অদ্বৈতচরণ দত্ত, বিদ্যুৎ মুখার্জি, জলধর মাহাত, ড. বিজয় আঢ্য, প্রণয় রায়, ডাঃ পি পি মুন্সী। আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন রমাপদ পাল, সুব্রত সামন্ত (বর্ধমান), হৃষীকেশ সাহা(উত্তরবঙ্গ)। সভা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী অজয় কুমার নন্দী।

মালদহের চাঁচলে মহর্ষি বাল্মীকি জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১৩ অক্টোবর মালহ জেলার চাঁচল নগরের হরিজন পল্লীর মনসা মন্দিরে আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে সকাল থেকে রামায়ণ গানের আয়োজন করা হয়। বিকেলে পাড়ার প্রবীণ বাসিন্দা চাঁদমণি হরিজন প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। সোমা হরিজন সকলকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করে সকলের হাতে পুষ্পস্তবক ও বাল্মীকি মুনির প্রতিকৃতি তুলে দেন। সমবেত হনুমান চাল্লিশা পাঠ হয়। মহর্ষি বাল্মীকি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জেলার সামাজিক সমরসতা সংযোজক দীপক চট্টোপাধ্যায়। পরে সবাই সহভোজে মিলিত হন।

বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে যুব সম্মেলন ও অভিভাবক সম্মেলন

বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার উদ্যোগে এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার গোলপার্ক কলিকাতার সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো ভাষণের ১২৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি সমারোহ উপলক্ষ্যে যুব সম্মেলন ও অভিভাবক সম্মেলন গত ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। যুব সম্মেলনে শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং সম সংখ্যক শিক্ষক ও অভিভাবকের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ মহারাজ। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ ও হরিপ্রসন্ন মিশ্র। পরদিন অভিভাবক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ মহারাজ। দুটি অনুষ্ঠানই পরিচালনা করেন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেলের কার্যকরী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ পাত্র।

শোক সংবাদ

অসমের হোজাই জেলার প্রবীণ স্বয়ংবেক তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রান্ত সেবা প্রমুখ দুলাল চন্দ্র শীলের সহধর্মিণী বাসন্তীদেবী গত ৬ সেপ্টেম্বর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

তিনি স্বামী, ২ পুত্র,২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মালদহের জহুরা কালী

স্বপন দাশগুপ্ত

আমবাগানের মাঝখানে মালদা শহর থেকে আট কিলোমিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে জহুরা কালীমন্দির। সবুজ ক্ষেত এবং আমবাগানে ঘেরা মন্দিরটি বাংলাদেশের সীমান্তের খুব কাছে অবস্থিত। মায়ের নাম অনুসারেই স্থানটির নাম জহুরাতলা। গোবিন্দপুর মৌজায়। মন্দিরের আশেপাশে বসতি নেই বললেই হয়। কথিত আছে মূল মন্দিরটি রাজা বল্লাল সেন (১১৫৯-১১৭৯) তৈরি করেছিলেন। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি পুনর্জাগরণের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে নগর রক্ষার মহাশক্তির সহায়তা কামনায় এই কালীমন্দির স্থাপন করা খুবই সম্ভব। তাহলে এটি অন্তত সাড়ে সাতশো বছরের প্রাচীন মন্দির। যদিও এর সমর্থনে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মালদহের ভাটিয়া পরগনার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের বাসকারী সাধক মা চণ্ডীকে কল্পনা করে একটি বেদি তৈরি করে পূজা শুরু করেছিলেন। এই সাধক তেওয়ারী বংশের চতুর্থ পুরুষ পরম সাধক হীরালাল এক রাত্রে স্বপ্নে দেখেন যে মা বিকট মূর্তি ধারণ করে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। মা বিকটরূপিণী, করুণার চিহ্নবিহীন, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, রক্তজিহ্বা নির্গত, ত্রিনেত্র বিস্ফারিতা, দন্তরাজি বিকশিত, দুপাশে দুটি বরাহদন্ত। চণ্ডীমূর্তির কায়া সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চণ্ডী দেবীর মহাকালীর এমন বিকট মূর্তি সারা বঙ্গে এমনকী ভারতেও আর কোথাও আছে বলে জানা যায় না। এটি আসলে মায়ের মূর্তি না বলে মুখোশ বলাই সমীচীন। রক্তবর্ণ সিন্দুরে চর্চিত, উঁচু ঢিপি বা বেদির উপর মায়ের একটি বড়ো মুখোশ। এর নীচে দুপাশে আরও দুটি মুখোশ অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের। দক্ষিণদিকে রয়েছে মহাদেবের দুটি মুখোশ ও একটি শিবলিঙ্গ। তেওয়ারীর পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর মুকুল তেওয়ারী বলেছিলেন যেহেতু শক্তি ও শিবের একত্র অবস্থান তাই গর্ভগৃহের ভিতরে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়েছিল। এক সময়ে গভীর জঙ্গলে আবৃত জহুরা দেবী ছিলেন দুর্ধর্ষ ডাকাত দলের আরাধ্য দেবী। ডাকাতদল পূজা দিয়ে মায়ের কাছে সাফল্য কামনা করে ডাকাতি করতে বেরিয়ে যেত। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল।

এক সময় রাঢ়বঙ্গ ও বরেন্দ্রভূমিতে বহু বছর ধরে মাৎস্যন্যায় চলেছিল। সে সময়ে বর্তমান মালদহ থেকে রাজশাহী রংপুর অঞ্চলে ঠাঙাড়ে ও ডাকাতদের উৎপাত ছিল খুব বেশি। ঠাঙাড়েরা যেমন সড়কপথে পথিকদের সর্বস্বান্ত করত তেমনি জলপথে বড়োবড়ো নৌকা দিয়ে ডাকাতি করে ফিরত। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব ডাকাত দলের প্রায় সবাই ছিল শক্তিসাধক। গভীর অরণ্যের মধ্যে মন্দির স্থাপন করে বা পরিত্যক্ত মন্দির সংস্কার করে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে কঠোর নিয়মে মায়ের আরাধনা করত। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই রকম পরিত্যক্ত মন্দির এখনও কিছু কিছু দেখা যায়। মালদহের জহুরা মন্দির তেমনই এক নিদর্শন। মা কালী কালক্রমে কীভাবে জহুরা কালীতে রূপান্তরিত হলেন সে রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত থেকে গেছে। এ সম্বন্ধে যে সব কাহিনি প্রচলিত আছে তা সবই আনুমানিক।

প্রচলিত কাহিনির একটিতে বলা হয়েছে রাজা হোসেন শাহের আমলে এক প্রবল প্রতাপশালী রাজপুরুষ মন্দিরটি ধ্বংস করতে এসে মায়ের অলৌকিক শক্তি অনুভব করে ফিরে যাবার সময় বলেন 'ইসমে জহরত হ্যায়'। এই উক্তি থেকে লোকমুখে মায়ের নতুন নাম প্রচারিত হয় 'জহুরা দেবী'। মালদহের মন্দিরে 'শ্রীশ্রী জহুরা মন্দির' নামই লেখা আছে। দ্বিতীয় কাহিনির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কালাপাহাড়ের নাম। কালাপহাড় হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতে করতে গৌড়বঙ্গে আসে। ভীতসন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা পরামর্শ করে মন্দিরের মধ্যে গর্ত করে মূর্তিটি সেখানে রেখে মাটি চাপা দিয়ে দেন। কালাপাহাড় মন্দিরে মূর্তি নেই দেখে ফিরে যায়। আজ পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে মূর্তিটি বের করার সাহস কেউ দেখায়নি।

প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার মায়ের পূজা হয়। পূজা দিনের বেলাতেই সম্পন্ন হয়। রাত্রে মন্দির বন্ধ থাকে। জহুরা দেবীর প্রধান উৎসব বৈশাখ মাসে। দূরদূরান্ত থেকে বহুলোক আসেন প্রধানত রোগ নিরাময় কামনায়। তখন বেশ বড়ো মেলা বসে। মন্দিরের চিরাচরিত নিয়মানুসারে বৈশাখের প্রথম ও শেষ শনিবার অথবা মঙ্গলবার পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। জহুরা মায়ের নাম সর্বত্র রোগমুক্তিকারী হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণকরা হয়। বহু রাজ্যের বহু লোক মায়ের কাছে মানত করে কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছে বলে জনশ্রুতি আছে। এদের মধ্যে সুদূর কেরল, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রের লোকও আছেন। ▮

মদনলাল ধিংড়াকে অপমান করেছিলেন গান্ধীজী

কৌশিক রায়

১৯০৯ সালের পয়লা জুলাই, সন্ধ্যাবেলা। লন্ডনের রাজসিক ইম্পিরিয়াল ইন্সটিটিউটের আলোকমালায় সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বানে সাহেবি স্যুট-মেট, গাউন পরিহিত সাহেব-মেম এবং তাঁদের বশংবদ ভারতীয় আধিকারিকেরা জমায়েত হতে শুরু করেছেন। অনুষ্ঠানের মধ্যমণি নিঃসন্দেহে ভারত সচিবের প্রধান রাজনৈতিক সহকারী (Aide-de-Camp) রাজপুতানা রেজিমেন্টের পূর্বতন আধিকারিক তথা ব্রিটিশ সিক্রেট পুলিশের এক অন্যতম হর্তাকর্তা— স্যার উইলিয়ম হাট কার্জন ওয়াইলি।

অতিথি অভ্যাগতদের মধ্যে দামি বাদামি কালারের স্যুট-টাই পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল একজন দীর্ঘকায়, সুদর্শন ভারতীয় তরুণকে। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কৃতী ছাত্র ওই তরুণটি। সপ্রতিভ, নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলা, রোম্যান্টিক চোখের তরুণটির দিকে মোহময়ী দৃষ্টি দিচ্ছিলেন সুন্দরী ইংরেজ তরুণীরাও। অসীম ধৈর্য নিয়ে অনুষ্ঠানটিতে প্রতিটি বক্তার বক্তৃতা শুনছিলেন ওই ভারতীয় যুবকটি। তাঁর দৃঢ় এবং ভাবলেশহীন মুখে কিন্তু কোনও অভিব্যক্তির ওঠানামা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। যেন কোনও দুরূহ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর সংকল্পে অটুট রয়েছে ওই যুবকটির মানসিকতা। অনুষ্ঠান শেষ হলো। অতিথিরা একে একে চলে যাচ্ছেন সভাকক্ষ ছেড়ে।

কার্জন ওয়াইলি ও তাঁর স্ত্রীও তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন। হঠাৎই যেন শিয়রে শমনের মতো, ভারতীয়দের ওপর অনেক অত্যাচার চালানো ব্রিটিশ পুঙ্গব— কার্জন ওয়াইলি এবং তাঁর পত্নীর সামনে এসে

দাঁড়ালেন সেই সুবেশ, ভারতীয় ছাত্রটি। হাতে তাঁর উদ্যত একটি ওয়েবলি অ্যান্ড স্কট রিভলবার। কার্জন ওয়াইলি ও তাঁর স্ত্রীকে সরাসরি চারটি গুলি করলেন যুবকটি। গুলি করলেন কার্জন ওয়ালিকে বাঁচাতে আসা পারসি চিকিৎসক কাওয়াস লালকাকাকেও। রক্তাক্ত অবস্থায়, সকলের ভয়বিহ্বল চোখের সামনে লুটিয়ে পড়ল কার্জন ওয়াইলি, তাঁর স্ত্রী এবং কাওয়াস লালকাকার নিষ্প্রাণ তিনটি শরীর। দেশমাতৃকার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পেরে উল্লসিত হলেন যুবকটি। আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য নিজের মাথায় রিভলবারের নল ঠেকালেন তিনি। তবে, সাতটা বুলেট খরচ হওয়ার পর যুবকটির আগ্নেয়াস্ত্রে আর গুলি ছিল না। তাই, প্রফুল্ল চাকীর মতো আত্মহত্যা করতে পারলেন না তিনি। গোরা পুলিশ তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলল মদনলাল ধিংড়া নামক সেই বীর যুবকটিকে।

স্বভাবতই, রাজদ্রোহের অপরাধে হত্যাকারী, ২৬ বছরের তরতাজা যুবক মদনলাল ধিংড়াকে ১৯০৯ সালের ২৩ জুলাই লন্ডনের ওল্ড বেহলি আদালতের কাঠগড়াতে তোলা হলো। মদনলালের বাবা গিট্টা মল ছিলেন অমৃতসরের প্রধান স্বাস্থ্য আধিকারিক। ছেলে স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থা এবং ব্রিটিশ বিরোধিতার দিকে ঝুঁকছে দেখে আগেভাগেই কার্জন ওয়াইলির বশংবদ ভৃত্য গিট্টা মল, খবরের কাগজে ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়ে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন— 'বিশ্বাসঘাতক' মদনলাল ধিংড়াকে তিনি 'ত্যাজ্যপুত্র' করলেন। তবে, 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে' প্রাণদান করার জন্য যে চির-নবীন প্রাণটি উন্মুখ হয়ে আছে, তার কাছে পরিবারের বিমুখতা কোনও বড়ো ব্যাপারই ছিল না। বিচারের নামে প্রহসনের সময় মোটেই আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি মদললাল ধিংড়া। তেজস্বী এই যুবকটি কোনও আইনজীবীরও সাহায্য নেননি। কাওয়াস লালকাকার অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য অনুতাপ স্বীকার করে মদললাল ধিংড়া দৃপ্তকণ্ঠে জানান— সাগরপাড়ের ইংরেজরা ভারতকে অত্যাচারের বধ্যভূমিতে পরিণত করেছে। তিনি যদি আত্মদান করেন তাহলে ভারতীয় যুবসমাজ অবশ্যই ইংরেজ-নিধনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মদনলাল ধিংড়া যুক্তি দেখিয়েছিলেন— ইংরেজরা যদি জার্মান হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজেদের জন্মভূমিকে রক্ষা করতে পারে, তাহলে আপামর ভারতবাসীরও অধিকার আছে ঘৃণ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও আমরণ প্রতিরোধ গড়ে তোলার।

পলাশি যুদ্ধে অন্যায্য বিজয়ের সময় থেকেই নবাব মিরজাফরকে 'ক্লাইভের গর্দভ' বানিয়ে ব্রিটিশরা যেভাবে ভারতকে নিঃস্ব করে দিতে শুরু করেছিল তার প্রমাণ, মদললাল ধিংড়া তুলে ধরেছিলেন তাঁর বলিষ্ঠ বক্তব্যে— ''I hold the English people responsible for the

murder of eighty millions of Indian people in the last fifty years, and the Britishers are also responsible for taking away 10 crores British pounds every year from India...it is perfectly justifiable to kill the Englishmen who are polluting our sacred land"— ''গত পঞ্চাশ বছরে আট কোটি ভারতবাসীকে হত্যা করার জন্য ইংরেজদের আমি দায়ী করছি। প্রতি বছর ভারতবর্ষ থেকে ১০ কোটি পাউন্ডের মতো অর্থ নিয়ে যাওয়ার জন্যও ব্রিটিশরা দায়ী...যে ব্রিটিশরা আমাদের পবিত্র জন্মভূমিকে কলুষিত করছে তাদেরকে হত্যা করা যুক্তিযুক্ত।" ১৯০৯ সালের ১৭ আগস্ট, লন্ডনের পেন্টনভিল সংশোধনাগারে ফাঁসি হয় প্রবাসী এই বিপ্লবীর। এই দেশপ্রেমিক যুবকের প্রতি প্রবল সহমর্মিতা দেখান ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সমর্থক এবং লন্ডনের অন্যতম সাম্যবাদী সংবাদপত্র— 'দ্য ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট'-এর মুদ্রক— গাই অ্যালড্রেড। মদনলাল ধিংড়ার ওপর তাঁর এই কাগজে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন ছাপা হয়।

বলাই বাহুল্য, ইংরেজ সরকারের ক্রোধ গিয়ে পড়ে গাই অ্যালড্রেড-এর ওপর। তাঁকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মদনলাল ধিংড়ার লড়াকু মানসিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন ব্রিটিশ একাধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী আইরিশ বিপ্লবীরাও। 'দ্য টাইমস' পত্রিকাতে ফাঁসির মঞ্চে দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়ার ভূয়সী প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল— ''He asked no questions. He maintained defiance of studied indifference. He walked smiling from the dock"— ''কোনও প্রশ্ন করেননি ধিংড়া। এক প্রস্তর কঠিন ঔদাসীন্য ছিল তাঁর মুখে। হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন তিনি। দুঃখের বিষয়, সর্দার ভগৎ সিংহ, শুকদেব ও রাজগুরুর মতো ভারতের মুক্তিযুদ্ধে আত্মবলিদানকারী মদনলাল ধিংড়ার প্রতিও চরম ঔদাসীন্য এবং বিরোধিতা দেখিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি, মদনলাল ধিংড়াকে আক্রমণ করেছিলেন তীব্র, নিন্দামূলক ভাষায়—"— ''India can gain nothing from the rule of murderers–no matter whether they are black or white. Under such a rule, India will be utterly ruined and laid waste"— ''হত্যাকারীদের শাসন থেকে ভারতের কোনও লাভই হবে না— তা সে হত্যাকারীর গায়ের রং সাদা বা কালো— যাই হোক না কেন। এই ধরনের শাসনে ভারতের চূড়ান্ত ধ্বংস এবং অবক্ষয় ঘটবে।" গান্ধীজীর এই বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ কিন্তু গোপনে করেছিলেন ইংল্যান্ডের দুই পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী— ডেভিড লয়েড জর্জ এবং স্যার উইনস্টন চার্চিল। তাঁরা পঞ্জাবের অমৃতসরে জন্মানো এই যুবকের সাহসিকতা এবং মৃত্যুর সময় তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রশংসা করেছিলেন। আসলে, যে পঞ্জাবের মাটি সর্দার ভগৎ সিংহ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের কুখ্যাত নায়ক জেনারেল মাইকেল-ও-ডায়ারের হত্যাকারী উধম সিংহ, চন্দ্রশেখর আজাদ, কর্তার সিংহ, গদর পার্টির স্থাপয়িতা লালা হরদয়ালের মতো বীর, স্বাধীনতাকামী সন্তানদের জন্ম দিয়েছে, সেই সপ্তসিন্ধুর দেশের বিপ্লববাদ তো প্রসারিত হয়েছিল মদনলাল ধিংড়ার বুকেও।

সম্ভ্রান্ত, ধনী পরিবারেই জন্ম হয়েছিল মদনলাল ধিংড়ার। তাঁর ছয় ভাইও বিদেশে পড়াশোনা করেছিলেন। অমৃতসরের এম.বি. ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পর মদনলাল ধিংড়াও উচ্চশিক্ষার জন্য 'কালাপানি' পেরোলেন। বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার 'ইন্ডিয়া হাউস'-এর সদস্য হলেন মদন। এই সংস্থাতেই যুক্ত থেকে 'ভারতের বিপ্লববাদের জননী' নামে খ্যাতা মাদাম ভিকাজী রুস্তমা কামা জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে ভারতের জাতীয় পতাকার প্রথম রূপটি প্রকাশ করেছিলেন। মদনলাল ধিংড়া ইংল্যান্ডে থাকাকালীন বুঝতে পেরেছিলেন— যদি স্বদেশি এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হয়— তাহলে পারিবারিক বড়লোকি চাল আর সাহেবি ধরাচুড়া পরা তাঁকে ছাড়তে হবে। সেজন্য ইংল্যান্ডে মালবাহকের কাজ করেছিলেন তিনি। বিলেতে আসার আগে মুম্বাইতে কারখানার শ্রমিক হিসেবেও কাজ করেছিলেন মদনলাল ধিংড়া। দাদা ডাঃ বিহারীলাল ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মদনলাল সবসময়েই মনে করতেন— ''মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী আমার ভাই... ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ।" সাধারণ ভারতবাসীদের হৃদয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে কী প্রবল ক্রোধ জমে আছে সেটা জানতে পেরেছিলেন মদনলাল ধিংড়া। তখন থেকেই ব্রিটিশ নিধনকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। বঙ্গভঙ্গের প্রধান হোতা কার্জন এবং বাঙ্গলার ছোটলাট লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন মদনলাল ধিংড়া। ভারতের চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজ, মাস্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মহারাষ্ট্রের বালকৃষ্ণ ও দামোদর হরি চাপেকার এবং রামপ্রসাদ বিসমিল আসফাক উল্লাহ ও ঠাকুর রোওশন সিংহের নেতৃত্বে কাকোরী ট্রেন ডাকাতির রোমাঞ্চকর কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু প্রাপ্য মর্যাদা পাননি অগ্নিদিনের সৈনিক মদনলাল ধিংড়া। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

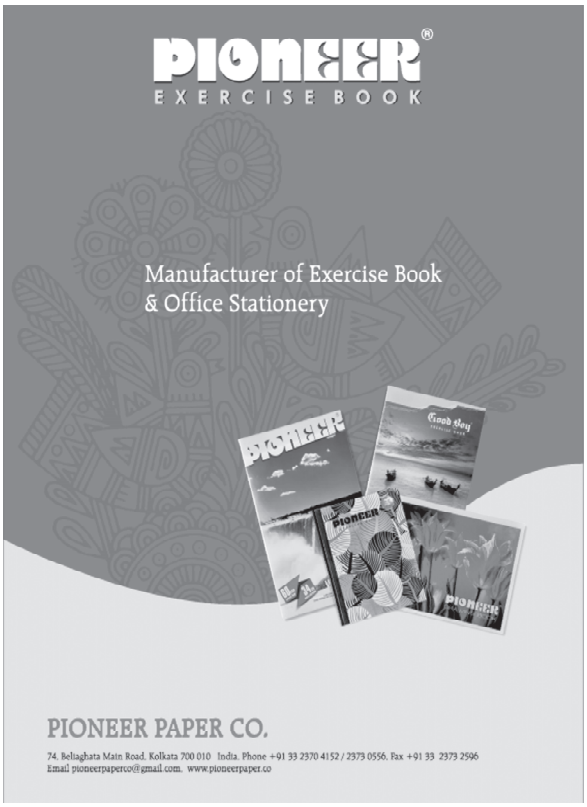

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

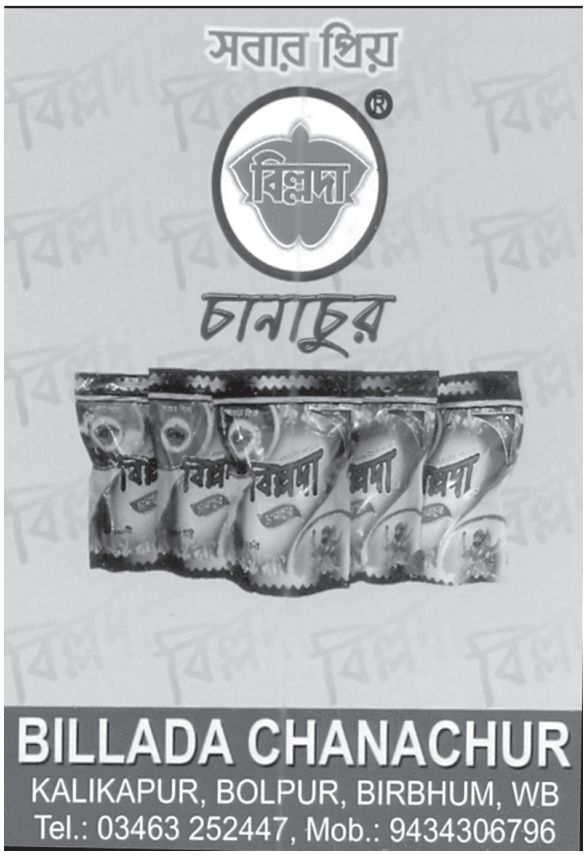

কেরলে বাম জমানায় হিন্দু নিধন

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি সিপিএমের হিংস্র বাহিনীর হাতে ৫২ বছর বয়সী বিজেপি কর্মী সন্তোষকুমার খুন হয়েছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণকারীরা কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা পিনারই বিজয়নের বিধানসভা কেন্দ্র ধর্মাদমে সন্তোষের বাড়িতে রাত সাড়ে এগারোটায় হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সে তার আগের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির হয়ে লড়েছিল। সিপিএমের ক্যাডাররা কোট্টায়াম জেলার একটা প্রাইভেট স্কুল আক্রমণ করে জানালা, আসবাব তছনছ করে— তারা দল বেঁধে আক্রমণ করেছিল। ওই স্কুলে ক্রিসমাসের ছুটিতে আর এস এসের প্রাথমিক শিক্ষাবর্গের প্রশিক্ষণ চলছিল, পুলিশ তাদের আটক করে। এরপরে সিপিএমের লোকেরা থানা আক্রমণ করে জানালা ভাঙে এবং সিসিটিভি ক্যামেরা ও পুলিশের জিপ ভাঙচুর করে বলপূর্বক তাদের আটক হওয়া লোকদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সিপিএমের সরকার, অতএব কোনো সমস্যা নেই।

বিজয়নের ডাকা শান্তি মিটিংয়ের মাত্র দু-মাসের মধ্যে সিপিএম বিজেপির চারজনকে খুন করেছিল। বিজয়ন নিজে ভাদিক্কাল রামকৃষ্ণাণের খুনের অন্যতম অভিযুক্ত। কান্নুরে পানুন্দ চন্দ্র খুন ও ধারাবাহিক হিন্দু হত্যা এবং তৎপরবর্তী হিংসা চলতে থাকে। তিরুঅনন্তপুরুমের ভারতীয়

মতামত

বিচারকেন্দ্রের নির্দেশক পি পরমেশ্বরণ, আর এস এসের দুজন প্রচারক ভাস্কর রাও কালম্বী ও আর হরির সঙ্গে কেরলের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ই কে নয়নার সভার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিচারপতি ভিকে কৃষ্ণ আয়ারও শান্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রতিবারই সিপিএম সেই শান্তি প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়।

সিপিএমের ভাববাদী নেতা নাম্বুদ্রিপাদ বলেছিলেন, ''আর এস এসের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরব।'' যখন পেরুমালার পাম্বা নদীতে তিনজন এবিভিপি কর্মীকে পাথর দিয়ে থেঁতলে মারা হলো তখন বিষয়টা বিধানসভায় উত্থাপিত হয়েছিল। নয়নার মুখ্যমন্ত্রী, তিনি বলেছিলেন, ''কেন, তারা কি এবিভিপি কর্মী নয়? এদের সঙ্গে আর কী করতে পারেন আপনারা?'' কান্নুরে একজন নিরপেক্ষ পুলিশ অফিসার সিপিএমের ঘাঁটি থেকে প্রচুর দেশি বোমা উদ্ধার করেছিল। নয়নার খুব হাল্কাভাবে জবাব দিয়েছিলেন যে বিষ্ণু উৎসবের জন্য বাজি মজুত করা হয়েছিল।

বিজয়ন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে দুজন মহিলাকে ১৮ মাসের শিশু-সহ জেলে পোরা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা সাজানো হয়েছিল। একজন মহিলা অটোরিক্সা চালককে নাগাড়ে হুমকি দিয়ে তার বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়; এর্নাকুলামের আয়ুর্বেদ কলেজের ছাত্রী পার্টি কমরেডদের লালসার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তাকে অবর্ণনীয় অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। আইন কলেজের ছাত্রীকে

সঙ্ঘের প্রচারক সুরেশের মৃতদেহ।

নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়।

১৯৮০-র দশকে বালগোকুলম্ নামে এক শিশু সংগঠন ঘটা করে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালনের আয়োজন করেছিল। সেই প্রচেষ্টা বানচাল করার সিপিএমের ষড়যন্ত্র ভেস্তে গেলে একটা পাল্টা সংগঠন বালসংগঠন বালগোকুলমের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বাধা দেয়; তখন তারা একটা সমান্তরাল জন্মাষ্টমী পালনের উদ্যোগ নেয়। গত দু' বছরে ২০১৫-২০১৭ তারা শোভাযাত্রা বার করে সেখানে সাধু ও সংস্কারক নারায়ণ গুরু ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছেন দেখানো হয়। এই জঘন্য প্রতারণার জন্য সারা রাজ্যে তারা নিন্দিত হয়েছিল। এক সময়ে হিন্দুরা কে কেলাপ্পাজির নেতৃত্বে আঙ্গাদিপুরম মন্দিরের পুনর্নির্মাণে তাদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছিল। এই সিপিএম মুসলমান ধর্মান্ধদের তোষণ করতে আওয়াজ তুলেছিল, ''যে পাথরে কুকুরে প্রস্রাব করেছে তাতে চন্দন মাখানো ছাড়া কেলাপ্পান আর কিছুই নয়''। হিন্দু কমরেডদের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়িতে গণপতি হোম করা ও ঐতিহ্যপূর্ণ পবিত্র দীপ জ্বালানো চলবে না। এক নববধূর গৃহে বিয়ে উপলক্ষ্যে সেই পবিত্র দীপ জালানো হয়েছিল। কিন্তু পার্টির স্থানীয় সচিব সেই গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে তাই দেখে সব ভেঙেচুরে দেয়, বলে, আমাদের পার্টির গ্রামে এইসব কিছুই চলবে না। হিন্দুদের বিয়ে, গৃহপ্রবেশ কোনো কিছুতেই হিন্দু ধর্মীয় আচার পালন করতে দেওয়া হবে না কিন্তু বাকি সব ধর্মের আচার নির্বিঘ্নেই করতে দেওয়া হতো।

ত্রিচুরের অনাবাসী বিখ্যাত চিকেন ব্যবসায়ী একে মঞ্জুর এক সঙ্গে আটখানা পাসপোর্ট রেখেছিল, জেড-৩৩১৫৯৭৯, এম-২৩০৭৪৩৩, এড-২৩৮০৬৫, জেড-২০৩৬০২৭, জেড-১৮৩৬৪৭০, জেড-০৩৩৬০০, এফ-৬৬১৬৬৫৫ ও জেড-১৫৮২৮৭৩। পাকিস্তানেও তার দোকান আছে। সে পাকিস্তানে অজস্রবার যায়। সে দুবাই থেকে অবৈধভাবে এই পাসপোর্টগুলো সংগ্রহ করেছে, আদালতে বয়ান দিয়ে নেদানচেরির অভিবাসন আধিকারিক এই তথ্য দিয়েছে। চেঙ্গামানাড়ের পুলিশ জানিয়েছে তার ব্যাগে সব সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র থাকে। সে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত।

ত্রিচুড়ের কেরলবার্মা কলেজে স্বামী চিন্ময়ানন্দজীর উপর ধর্মীয় আলোচনাচক্রের সময় সিপিএম হামলা চালায়। অমৃত ইন্সটিটিউট অব মেডিকাল সায়ান্সেসের ভবন নির্মাণকালে সিপিএমের মুখপত্র দেশাভিমানীতে অভিযোগ করা হয় যে এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য আমেরিকায় কিডনি বিক্রি করা। স্বামী চিদানন্দপুরীর বেদান্ত ক্লাসেও তারা গোলমাল পাকায়। সেখানে নাকি হিন্দু মৌলবাদ শেখানো হচ্ছিল। সবটাই যে মিথ্যে তা প্রমাণ করা যায়। সেই সময়ে আব্দুল নাজির মাদানি বলে এক মুসলমান হিন্দুবিরোধী ঘৃণা ও বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার অপরাধে জেলে ছিল আর তখন সিপিএম নেতারা তাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া ও সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল।

হিন্দুবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি আরও দেখা যায়--- ওনাম উৎসব পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা, ওনাম উৎসবের সময়ে ফুলের কার্পেট বিছানো ও সরকারি অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যপূর্ণ দীপ জ্বালানো বন্ধ, শবরীমালা মন্দিরে কতদিন পূজো দেওয়া যাবে সব ওরা ঠিক করবে— এর উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজে ভাঙন ধরানো। ১৯২১ সালের মোপলা বিদ্রোহে হাজার হাজার হিন্দুর উপর নির্যাতন নেমে আসে— ব্যাপক হত্যালীলা, লুঠ, ধর্ষণ সব চলেছিল। সিপিএম তাকে 'কৃষক বিদ্রোহ' বলে গৌরবান্বিত করে। স্বাধীনতার পরে সিপিএম হিন্দুমেধ যজ্ঞের প্রধান হোতা ইন্ডিয়ান মুসলিম লিগকে সাদরে থালায় সাজিয়ে মন্ত্রিত্বের পদ উপহার দেয়।

স্বাধীনতার আগে তারা যুক্তি দেয় যে ভরত একটা জাতি নয় আর মুসলমানরা ভয় পায় যে স্বাধীন ভারতে তারা হিন্দু আধিপত্যের শিকার হবে, তাই পাকিস্তানের দাবি যথার্থ ও গণতান্ত্রিক। স্বাধীনতার পরে মালাপ্পুরমকে মুসলমানদের জেলা বলে ঘোষণা করেন সিপিএমের নাম্বুদ্রিপাদ— কোন যুক্তিতে তা কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? ২০০৩ সালে মারাদে আটজন হিন্দু মৎস্যজীবীকে কুপিয়ে হত্যা করে মুসলমানরা আর সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেই অপরাধের সিবিআই তদন্ত বন্ধ করে দেয়।

মুসলিম সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে যদি প্রমাণ হয় যে অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানে মন্দির ছিল তাহলে তারা ওই জমি হিন্দুদেরকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু যে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই খননকার্য চালিয়েছিল তার সদস্য কেকে মহম্মদ বলেছেন যে বামপন্থী ইতিহসবিদ ইরফান হাবিব তাদের সেই অবস্থান বদল করতে রাজি করিয়েছিলেন। সিপিআই/ সিপিএম সঙ্ঘের শাখার মাঠে ভাঙা কাঁচ ও কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। নয়নারের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে উত্তরাঞ্চলের ডিআইজি কুমারস্বামী একটা সার্কুলার জারি করে, তাতে ছিল, ''যেসব আর এস এসের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে আমার প্রাতরাশের আগে আমাকে তাদের তালিকা দাও''।

২০১৭ সালে নৈয়াত্তিপুরম থুঞ্জন ভক্তিপ্রস্থান পাদন কেন্দ্রম দ্বারা আয়োজিত কর্মশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেওয়ার কথা ছিল বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তেনালা বালকৃষ্ণ পিল্লাইকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সেই পুরস্কার প্রদান করতে উপস্থিত হননি, কারণ সেখানে কেরল রাজ্য বিজেপি সভাপতি কুম্মানম রাজশেখরন উপস্থিত থাকবেন বলে কথা ছিল। তার আগের বছর রাজশেখরনের ওই পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল তিনি বিধানসভা নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত থাকায় পুরস্কার নিতে পারেননি। এই সিপিএমের ভিএস অচ্যুতানন্দন ১৯৯৮ সালের কোয়েম্বাটোর বিস্ফোরণ কাণ্ডের অপরাধে দণ্ডিত আসামি আব্দুল নাসের আল মাদানির সঙ্গে এক মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

কেরলের বাম সরকার ১৮৫০ জন বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার আদেশে সই করতে পাঠালে রাজ্যপাল সদাশিবম তা করতে অস্বীকার করেন। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা ধর্ষণ, ড্রাগচালান, মহিলা ও শিশুদের উপর অত্যাচার প্রভৃতি জঘন্য অপরাধে অপরাধী। ■

পঞ্জীকরণ না হলে হিন্দু বাঙ্গালিকে আবার উদ্বাস্তু হতে হবে

আবীর গাঙ্গুলী

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দুরা ভারতীয় নাগরিকত্ব পেয়ে গেছেন। এরপর বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান গ্রহণ করে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। ১৯৭২ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি হয় দুটি স্বাধীন দেশের সঙ্গে যাতে একে অপরকে একটি সহযোগী দেশ হিসাবে গ্রহণ করে। সুতরাং পাকিস্তান পর্ব শেষ। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসার আর কোনো কারণ থাকল না। কিন্তু ঘটনা যে অন্যরকম তা সবাই জানে। ইসলামি সমাজে অন্য ধর্মের মানুষেরা বারবার আক্রান্ত হন সুতরাং আবার উদ্বাস্তু আসা শুরু হলো, পাকিস্তান আমলের মতোই। সমস্যা হলো ১৯৭২ থেকে যেসব হিন্দু উদ্বাস্তু আসতে থাকলেন আগের মতো তাঁদের জন্য কোনো আইনি রক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের একটি প্রধান পার্থক্য হলো যে এই উদ্বাস্তুদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়া কঠিন হয়ে গেল। এমনকী তাঁদের ভারতে থাকাটাই বেআইনি। এর মধ্যে ভারতের নাগরিকত্ব আইন কয়েকবার সংশোধন করে আরো কঠোর হয়েছে। জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের সুবিধা বাতিল করা হয়েছে। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন উদ্বাস্তুদের নাগরিক হবার পথে আরও বাধা সৃষ্টি করে।

গত কয়েকদশক ধরে উদ্বাস্তু সংগঠনগুলি নাগরিকত্বের দাবি রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে বারবার করে এসেছে কিন্তু সিপিআইএম, তৃণমূল ও কংগ্রেস উদ্বাস্তুদের এই স্বীকৃতির জন্য কোনো প্রচেষ্টা নেয়নি। গত ৪৫ বছর ধরে কেন্দ্রে মূলত রাজত্ব করেছেন কংগ্রেস দল। তারা এই বিষয়টি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি। এর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত মানবাধিকার সংগঠন, শিল্পী-সাহিত্যিক- সাংবাদিক, সংবাদপত্র ও টিভি বা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা— কোনও মহল এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেনি। এদের সবার

মতামত

নীরবতার একটাই কারণ যে উদ্বাস্তু নিয়ে আলোচনা হলেই বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদের দাপটের খবর সবাই জেনে যাবে, মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার আড়াল আর কাজ করবে না। যদিও বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ও বেশ কয়েকজন অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, লেখক, মানবাধিকার সংগঠন এই নিয়ে যথেষ্ট সরব।

নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৯ জুলাই ২০১৬-তে লোকসভায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ পেশ করেন। এই সংক্ষিপ্ত বিলটিতে বলা হয়েছে যে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের যাঁদের পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ ও বিদেশি আইন ১৯৪৬-এর থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তাদের আর অবৈধ অধিবাসী বলে গণ্য করা হবে না। সংখ্যালঘু বলতে হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন পার্সীদের উল্লেখ করা হয়েছে। এর ফলে তারা ভারতীয় নাগরিক হবার জন্য যোগ্য হলেন। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টান উদ্বাস্তুদের ঘরবাড়ি ছাড়ার বা ভারত ছাড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তাঁরা আগামী দিনে ভারতের নাগরিক হিসেবে এদেশেই থাকবেন।

এরপরই শুরু মুসলমান তোষণবাদীদের খেলা। এই আইনটি পাশ হয়ে গেলে হিন্দু উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেয়ে যাবেন। কিন্তু

বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এই অধিকার পাবে না। বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়নের কোনো আইনি জটিলতা থাকবে না। ফলে বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের জন্য মাঠে নেমে পড়লেন সেকুলার নেতারা। বিলটি লোকসভায় পেশ করা হলে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি প্রধান দল তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিআইএম ও কংগ্রেস এর বিরোধিতা করলো। এদের বিলের বিরোধিতার কারণ একটাই কেন এই বিল থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়া হলো। এদের সবার মূল কথা এই বিল সংবিধান বিরোধী। এটি সংবিধানের ১৮নং ধারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে। ধর্মের ভিত্তিতে এই বিভাজন সম্ভব নয়। এই অভিযোগগুলির জবাব— এই আইনটি করা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্বাস্তুর সংজ্ঞা অনুযায়ী যা আগেই বলা হয়েছে। সত্যিকারের উদ্বাস্তু স্বার্থে যারা আন্দোলন করেন তাদের উচিত এই তিনটি দলের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের সচেতন করা ও এদের ইসলামি তোষণবাদী রূপকে চিনিয়ে দেওয়া। যাদের অত্যাচারে উদ্বাস্তু হয়ে মানুষেরা পালিয়ে এসেছেন সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করাই এই তিনটি দলের মূল উদ্দেশ্য। এজন্যই এই বিলটি পশ্চিমবঙ্গের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিল পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব নির্ধারণ করবে।

পশ্চিমবঙ্গে আমরা কেন এন আর সি চাই তার উত্তরটি খুব সহজ। বাংলাদেশ গঠনের পর বিশেষত বামফ্রন্ট সরকার আসার পর দলে দলে বাংলাদেশি মুসলমান পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতে থাকে। ৬ মে, ১৯৯০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লোকসভায় বলেছিলেন যে ভারতে ১ কোটি বাংলাদেশি আছে। ১১ অক্টোবর ১৯৯২-এর গণশক্তি পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লিখলেন, ১৯৭৭ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত বি এস এফ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫২৯ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এরপর ১৪ জুলাই ২০০৪ সালে কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জয়সোয়াল লোকসভায় জানালেন যে ভারতে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯৫০ জন বাংলাদেশি রয়েছে। অবশেষে ২০০৫-এ লোকসভাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা ও সিপিএমের তাদের দিয়ে ভোট করানোর অভিযোগ তুলে স্পিকারকে কাগজপত্র জুড়ে হৈ চৈ বাঁধালেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ যে ভয়ানক সমস্যা তা জ্যোতি বসু থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই জানেন। জ্যোতি বসুরা বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে মূলত ভোটেরখেল খেলছিলেন ক্ষমতায় থাকার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দল বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ করবার ইসলামি পরিকল্পনায় মদত দিচ্ছেন।

আমরা চাই পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করে পশ্চিমবঙ্গ যে আদর্শে গঠিত হয়েছিল তা ফিরিয়ে আনতে। সেজন্য আইনি ও সাংবিধানিক পথে পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি চালু করে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করতে। এর জন্য কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান উদ্বাস্তু কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, কারণ ২০১৫ সালে পাসপোর্ট ও বিদেশি আইন সংশোধন করা হয়ে গেছে। এছাড়া নাগরিকত্ব বিল সবাই মিলে পাশ করাতে হবে ফলে আগামীদিনে উদ্বাস্তুরা সবাই নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছেন। খুব পরিষ্কার করে উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে যে বিরাট তফাত তা বলতে হবে। তারপর বলতে হবে এন আর সি চালু করবার কথা। পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে যদি ইসলামি মৌলবাদী আধিপত্য ও দখলের হাত থেকে বাঁচাতে হয় তবে এন আর সি করে বাংলাদেশি মুসলমানদের চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়িত করতে হবে। কোনো ভারতীয় মুসলমানের এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এটা নরেন্দ্র মোদী সরকারের কোনো বিশেষ স্বার্থ রক্ষার ব্যাপার নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের প্রশ্ন। তা না হলে আগামীদিনে হিন্দু বাঙ্গালিকে আবার উদ্বাস্তু হতে হবে? ▮

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

অটোমোবাইল সেক্টরে মন্দা সাময়িক

জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জী

বিগত কয়েকদিন ধরে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের অন্যতম আলোচনার বিষয় হলো ভারতীয় অর্থনীতি। জিডিপি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট-এর বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের মধ্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে গেল গেল রব উঠেছে। বিশেষ করে অটোমোবাইল বা মোটরযান সেক্টর নিয়ে চিন্তায় ঘুম উড়ে গিয়েছে তথাকথিত অর্থনীতিবিদদের। জিডিপি-র পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে অটোমোবাইল বা মোটরযান সেক্টরকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তথাকথিত সংবাদমাধ্যমের একাংশ। এবার দেখে নেওয়া যাক অটোমোবাইল সেক্টরের বৃদ্ধির গতি কমে যাওয়ার কারণসমূহ। প্রথমত, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আদেশে ভারত স্টেজ-৪ যানবাহন থেকে ভারত স্টেজ-৬ যানবাহনে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মূলত অতিরিক্ত দূষণকে কমানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং এটাও বলা হয়েছে ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ভারত স্টেজ-৬ যুক্ত যানবাহন বিক্রি করা যাবে। স্বাভাবিকভাবে ক্রেতারা এই সময়ে ভারত স্টেজ-৪ যুক্ত যানবাহন ক্রয়ের ব্যাপারে আগ্রহ হারাচ্ছেন। ফলত অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে ডিমান্ড সাইড বা চাহিদা হ্রাস পেলে তার প্রকোপ গিয়ে পড়ে উৎপাদনের উপর।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, সরকার ক্রমবর্ধমান দূষণকে কমানোর জন্য ইলেকট্রিক যানবাহনের উপর জোর দিয়েছে। যার ফলে ইলেকট্রিক যানবাহন ক্রয়ের উপর কর হ্রাসের সুবিধাও দেওয়া হয়েছে FAME-II প্রকল্পের আওতায়। উপরে উল্লেখিত বিষয় থেকে স্পষ্ট যে অটোমোবাইল বা মোটরযান সেক্টরের বৃদ্ধি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

আর একটি সেক্টর নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে হইহই পড়ে গিয়েছে সেটি হলো সিমেন্ট সেক্টর। হাউসিং ফর অল অর্থাৎ সবার জন্য বাড়ি প্রকল্পের আওতায় ২০২২ সালের মধ্য ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি পরিবারের বাড়ি নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সিমেন্ট সেক্টরের বৃদ্ধিও অবশ্যম্ভাবী।

জিডিপি-র পতনের কথা মাথায় রেখে সরকার ব্যাঙ্ক সুংযুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে অতিরিক্ত অর্থ জোগান দেওয়া হচ্ছে যাতে করে বাজারে অর্থ পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্তমান থাকে ও ম্যানুফ্যাক্টচারিং সেক্টর বা উৎপাদন সেক্টরে বৃদ্ধি ঘটে। ব্যাঙ্ক সংযুক্তিকরণের ফলে Bad loan বা অপরিশোধিত ঋণের পরিমাণ কমবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রেপো রেট এবং ব্যাঙ্ক রেট কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে ঋণের হার অনেকাংশে কমে যাবে এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থের জোগান বাড়বে ও সঙ্গে সঙ্গে বেকারত্বের পরিমাণও কমবে। এবার আসা যাক জিএসটি অর্থাৎ গুডস্ অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স-এর কথায়। জিএসটি পরিষদে সমস্ত রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জিএসটি-র হার বিবেচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

সম্প্রতি কর্পোরেট কর ৩০ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, যার ফলে শেয়ার বাজারে ব্যাপক উত্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং বিদেশি কোম্পানিগুলো ভারতে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। ফলে আগামীদিনে জিডিপি-এর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পরিণত করার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছে সেটির বস্তবে রূপায়ণ হবে বলে আশা করা যায়। ◻

শবরীর প্রতীক্ষা

পঞ্চবটী বন। বনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে গোদাবরী নদী। এই পঞ্চবটী বনে গোদাবরীর তীরে ছোট্ট একটি কুঁড়েঘরে থাকে শবরী। শবরী চণ্ডালের মেয়ে। দেখতে খুবই কুৎসিৎ। বিয়ের বয়স হলে তার বাপ-মা রাতের অন্ধকারে দূরের এক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে রাতেই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেয়। যেতে যেতে বনের মধ্যে সকাল হলে পাত্র শবরীর কদাকার মুখ দেখে আঁতকে উঠে বনেই তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। সেই থেকে শবরী বনে। মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয়স্বজন নেই।

পঞ্চবটী বনে মুনি ঋষিরা থাকতেন। শবরী দিনের বেলা কারো সামনে বেরুত না। পাছে তাকে দেখে কেউ ভয় পায়। লুকিয়ে গভীর বনে গিয়ে শুকনো কাঠ কুড়িয়ে জমা করে রাখত। গভীর রাতে চুপি চুপি ঋষিদের আশ্রমে সেই কাঠ রেখে আসত। মুনিঋষিরা যে পথে যাতায়াত করে সেই পথ পরিষ্কার করে রাখতো।

শবরীর এই গোপন কাজ ও নীরব সেবা একদিন ধরা পড়ে যায় এক বৃদ্ধ ঋষির কাছে। তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন শবরীর মুখের দিকে। মুখখানি ফুলের মতো সুন্দর, আগুনের মতে পবিত্র। সস্নেহে তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে রামনামে দীক্ষা দেন। দিনের পর দিন শবরী গুরুর দেওয়া রামনাম জপ করে আর আগের মতোই ঋষিদের সেবা করে যায় গোপনে। শবরীর গুরুদেব একদিন শবরীকে কাছে বসিয়ে বললেন, মা আমার সময় পূর্ণ হয়েছে। ইচ্ছা ছিল শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের চোখে দেখে যাব, কিন্তু আর সময় নেই। আশীর্বাদ করছি তুমি শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে ধন্য হবে। এই বলে গুরুদেব শরীর ত্যাগ করলেন।

কয়েকদিন পর শবরীর মনে হলো তার গুরুদেবের কথা। তিনি বলেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র অসবেন এই পঞ্চবটী বনে। পঞ্চবটী হবে তীর্থস্থান। সেইদিন থেকে শবরী প্রত্যহ ভোরে স্নান করে ফুল তোলে, জল আনে। খুঁজে খুঁজে চেখে দেখে মিষ্টি ফল আনে। তারপর সারা রাস্তায় ফুল বিছিয়ে চুপ করে বসে থাকে তার কুঁড়েঘরের দুয়ারে – প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায়। তার মনে আশা, প্রভু এলে তাঁর পা ধুইয়ে দেবে, নিজের মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দেবে। মিষ্টি ফল খেতে দেবে, শীতল জল দেবে পান করতে আর পাতার আসন বিছিয়ে দেবে বসবার জন্য। দিনের পর দিন চলে যায়। চলে যায় বছরের পর বছর। শবরী বৃদ্ধা হয়ে যায়। কিন্তু প্রতীক্ষা চলতে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন শবরী দেখতে পেল পঞ্চবটীর নতুন রূপ। সারা বনভূমির গছপালা সতেজ, যেন হাসছে। শাখায় শাখায় বিচিত্র ফুলের মেলা। পাখিরা মিষ্টিসুরে গান গাইছে। দেখলেই মনে হবে প্রকৃতি যেন কারো অভ্যর্থনার আয়োজন করে বসে আছে। প্রতিদিনকার মতো শবরী সব আয়োজন করে তার কুঁড়েঘরের দ্বারে বসে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের কথাই ভাবছিল। এমন সময় সে শুনতে পেল, কে যেন তাকে ডাকছে– 'শবরী'। চমকে উঠল শবরী। আবার সেই ডাক শুনতে পেল। মধুর কণ্ঠে তার নাম শুনে শবরী দিশেহারা হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল শবরী। সামনে তার প্রভুকে দেখে অভিভূত সে। আনন্দ বিহ্বলে শবরী তাঁর রাঙাপায়ে লুটিয়ে পড়ল। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ভক্তকে টেনে তুলে নিলেন। লক্ষ্মণের চোখে জল। শবরী তাড়াতাড়ি তার কুটির থেকে গাছ থেকে তুলে রাখা টাটকা ফল, ভাঙা মাটির ভাঁড়ে শীতল জল নিয়ে এল। ভক্তের দেওয়া প্রসাদ ভগবান গ্রহণ করলেন। তারপর অনেক গল্প করলেন। এভাবে ভক্ত ও ভগবানের মিলন হলো। অপূর্ব মিলন। পঞ্চবটী আর গোদাবরী হয়ে রইল পুণ্যতীর্থ।

—হরিপদ ঘোষ

ভারতের পথে পথে

মথুরা

সাত মোক্ষপুরীর একটি মথুরা। প্রাচীন মধুরাপুরী রূপান্তরিত হয়েছে মথুরামণ্ডলে। ক্রমে ক্রমে হয়েছে মথুরা। শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লবণাসুরকে বধ করে মধুরা নগরীর পত্তন করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে কুষাণদেরও রাজধানী ছিল মথুরায়। বৌদ্ধকেন্দ্র রূপ্যে একসময় প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯ ও ২১ তম জৈন তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও নেমিনাথের জন্ম ও কর্ম এই মথুরায়। ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে গজনির মামুদ মথুরা নগরী ধ্বংস করে ফেলে। ১৫০০ খ্রিস্টব্দে সিকন্দর লোদি ধ্বংস করে। ১৬৬০ খিস্টাব্দে আওরঙ্গজেদের ধ্বংসলীলার শিকার হয় এই ব্রজভূমি। ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান এই মথুরায়। কেশবদেব ও দ্বারকাধীশের মন্দির অন্যতম। রয়েছে ভগবত ভবন বা গীতা মন্দির। যমুনায় রয়েছে বহু ঘাট। রয়েছে কংসকেল্লার ধ্বংসাবশেষ। ১৫৯ টি কুণ্ডের মধ্যে এখন রয়েছে ৪টি– শিবতাল, পাটোরা, বলভদ্র ও সরস্বতী কুণ্ড। শহরের চারদিকে চারটি শিবমন্দির– ভূতেশ্বর, পিপলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর ও রঙ্গেশ্বর আছে।

জানো কি?

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ কোন রাজ্যে ও কোথায়।

(১) **সোমনাথ**-- জুনাগড়, গুজরাট (২) **মল্লিকার্জুন**– শ্রীশৈলম্, অন্ধ্রপ্রদেশ (৩) **মহাকাল**– উজ্জয়িনী, মধ্যপ্রদেশ (৪) **ওঙ্কারেশ্বর**– নর্মদাতীরে, মধ্যপ্রদেশ (৫) **বৈদ্যনাথ**–দেওঘর, ঝাড়খণ্ড অথবা পারলি, মহারাষ্ট্র (৬) **ভীমশঙ্কর**– পুনা, মহারাষ্ট্র (৭) **রামেশ্বরম্**– সেতুবন্ধ, তামিলনাড়ু (৮) **নাগেশ্বর**– দারুকাবন, গুজরাট (৯) **ত্র্যম্বকেশ্বর**– নাসিক, মহারাষ্ট্র (১০) **বিশ্বনাথ**– বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ (১১) **কেদারনাথ**– হিমালয়, উত্তরাখণ্ড (১২) **ঘৃষ্ণেশ্বর**– ইলোরা, মহারাষ্ট্র।

ভালো কথা

নারায়ণ সেবা

পুজোর কদিন আমরা খুব আনন্দ করি। ষষ্ঠীর দিন থেকেই বাড়িতে রান্না বন্ধ। চারদিন পুজোমণ্ডপ লাগোয়া প্যান্ডেলেই দুপুর ও রাতের খাওয়াদাওয়া। কাজেই বাড়ির কাজকম্ম নেই। তবে এবারে ক্লাব থেকে ঠিক করা হয়েছিল যে, দুপুর বারোটায় ও সন্ধ্যে সাতটায় যারা রাস্তায় থাকে তাদের প্রথমে খাওয়ানো হবে। আমরা ছোটোরা আগে থেকে তাদের বলে রেখেছিলাম। সেইমতো চারদিনই দুপুরে ও সন্ধ্যায় তাদের খুব যত্ন করে প্রথমেই খাওয়ানো হয়েছে। পাড়ার দাদারা পরিবেশন করেছে। আমরা ছোটোরা জল ও লবণ দিচ্ছিলাম। বড়োরা তাদের কাছে গিয়ে আর কী লাগবে জিজ্ঞাসা করছিলেন। তাদের চোখেমুখে আনন্দ ফুটে উঠছিল। সুনন্দার ঠাকুমা বলছিল এবারের পুজোটা সার্থক হলো, যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ সেবা ।

অন্বেষা সেন, নবম শ্রেণী, কল্যাণী, নদীয়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রার্থনা

শুভম সেন, সপ্তম শ্রেণী, ঝালদা, পুরুলিয়া।

দুর্গা মা দুর্গা মা শক্তি দাও মোদের
শক্তি ছাড়া সম্মান নেই এই পৃথিবীতে।
মা সরস্বতী বিদ্যা দাও বুদ্ধি দাও মোদের
বিদ্যা বুদ্ধি ছাড়া কেউ মানে না জগতে।

মা লক্ষ্মী ধন দাও ধনী কর মোদের
সম্পদ ছাড়া এ সংসারে কষ্ট পায় সকলে।
কার্তিকঠাকুর যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ কর মোদের
গণেশঠাকুর সিদ্ধি দাও দেশের কল্যাণ তরে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৯।।

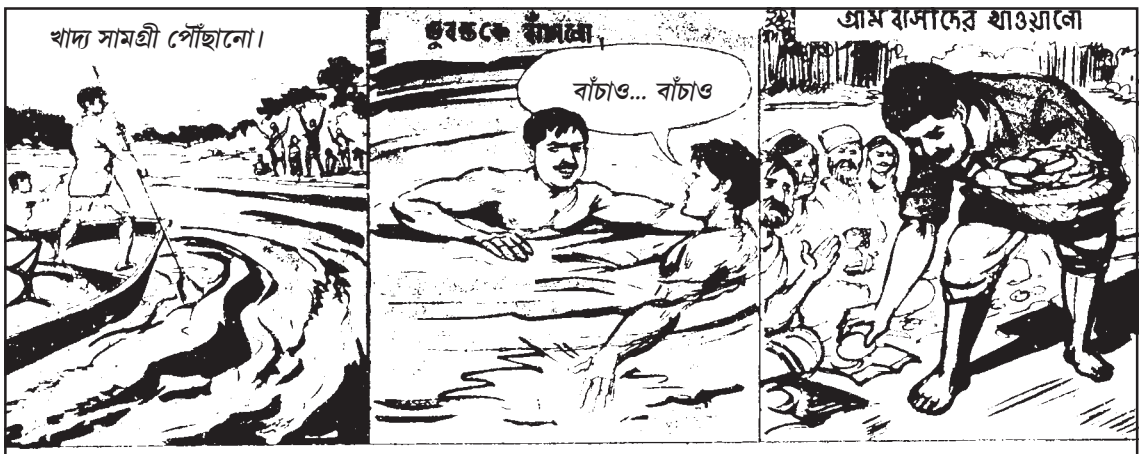

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে কেশবের শক্তি সামর্থ্যের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। একদিন অমূল্যরতন ঘোষ নামে এক সহপাঠী ঈর্ষাবশত তার কাছে এলো।

একবার এক রুক্ষভাষী বক্তা লোকমান্য তিলকের সম্পর্কে যা তা বলছিলেন। লাগালেন...

শ্রোতাদের মধ্যে বসেছিলেন কলকাতার এক নেতা মৌলানা লিয়াকত হোসেন। দৌড়ে এলেন কেশবের কাছে।

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতামালার প্রেক্ষিতে হিন্দুত্ব

অত্রি মল্লিক

''বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝংকার।।''

—রবীন্দ্রনাথ

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের শুরুতেই ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর দিনটিতে আমেরিকার কলম্বাস হলে বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ বস্তুতই বিশ্বসমাজ ও মননে যুগান্তকারী ঝংকার এনে দিয়েছিলেন। ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর মাসটিতে সর্বমোট সতেরো দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে (Parliament of Religions) ভারতবর্ষ তথা হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় বারোটি বক্তৃতা করেছিলেন। শিকাগোর ওই মহাসম্মেলনে তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই আক্ষরিক অর্থে ছিল যুগপোযোগী, প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। তাঁর বক্তৃতামালা সত্যিই 'বিশ্ববাণী'র রূপ নিয়েছিল। এই বিশ্বধর্ম সম্মেলনের ঐশ্বরিক প্রতিভা স্বামী বিবেকানন্দের মহিমামণ্ডিত আবির্ভাবের গুরুত্ব স্বীকার করেই গোটা বিশ্ব স্মরণ উদ্‌যাপনে শামিল হয়েছে প্রায় বিগত এক বছর সময় ধরে, যা আজ ১২৫ বছর পূর্তির সমাপ্তির লগ্নে দাঁড়িয়ে। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হলো তৎকালীন ও আজকের বিশ্বসমাজে স্বামীজী প্রদত্ত শিকাগো বক্তৃতামালার সারবত্তার নির্যাস কতখানি ব্যাপৃত। বক্তৃতাগুলি পড়লে স্পষ্টতই অনুভূত হয় স্বর্গীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর বাক্য প্রাণের গভীর থেকে উদ্‌গত হয়ে সভায় উপস্থিত সকলের হৃদয়ে স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ও প্রবন্ধকার রোমাঁ রোলাঁর অভিমত ছিল যে, যখন স্বামীজী মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন, ''তখন তাঁর কর্তৃত্বমূলক উপস্থিতি সবাইকে যেন এক মুহূর্তে অন্যান্য সদস্যের কথা ভুলিয়ে দিল।'' অতি সঙ্গত কারণেই 'Critic' পত্রিকা ১৮৯৩ সালের ৭ অক্টোবর বিবেকানন্দের সম্পর্কে লেখে : ''হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো আর কেউই ধর্মমহাসভার মূল মর্মকথা, সীমাবদ্ধতা এবং এর সুন্দরতম প্রভাবের কথা এতো ভালোভাবে ব্যক্ত করেননি।'' আসলে ধর্ম, ধর্মমত, উপাসনা পদ্ধতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঐতিহ্য— এই সবকিছুকে একত্র করে নিয়ে যে মৌলবাদী ও সংকীর্ণ চিন্তাধারা জগৎ জুড়ে স্থান নিয়েছিল এবং যার রোষানলে ভারতবর্ষীয় হিন্দুও পড়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের এহেন উপস্থিতি ও দৈববাণীসম বক্তৃতামালা এক লহমায় ধারণার জগতে আমূল পরিবর্তন এনে

ফঃ ৬

দিয়েছিল। তৎকালীন সময়েই 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকা স্বামী বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করে লেখে, 'নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভায় তিনিই শ্রেষ্ঠ'। বিশ্বমঞ্চে তাঁর বক্তৃতাসমূহে প্রভাব এতটাই সুতীব্র যে ওই একই পত্রিকা প্রায় একশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ২৯ আগস্ট, ১৯৯৩ সালে স্বামীজীকে '১৮৯৩ ধর্মমহাসভা তারকা' (The Star of the 1893 Parliament) বলে অভিহিত করে। সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সনাতন সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের তথাকথিত পণ্ডিতেরা 'সাহেবি জাদুতে' পরিকল্পিতভাবে বিকৃত করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, শিকাগোর ধর্ম মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাগুলি ছিল এ নিরিখে যোগ্যতমের যথার্থ প্রত্যুত্তর। হিন্দু দর্শন ও ধর্মের যে মূল কথা হলো একাত্ম মানবদর্শন (Integral Humanism) —মনে-প্রাণে সেটিকে ধারণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং। হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি যে আদতে কতখানি পরধর্মসহিষ্ণু, কতখানি তার ব্যাপ্তি, কতটা তার ব্যাপকতা, সেটি বিশ্বদরবারে উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'হিন্দু' শব্দটি কোনো বিশেষ একটি ধর্মমত নয়, ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিই হলো হিন্দু সংস্কৃতি— এই উপলব্ধিকে উপস্থাপন করে সকল রকম ভ্রান্ত ও গোঁড়া ধারণায় ইতি টেনে দিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বিখ্যাত ভূমিকায় (Introduction to the Complete Works of Swami Vivekananda) লিখেছেন, ''Of the Swami's address befor the Parliament of Religions, it may be said that when he began to speak, it was of 'the religious ideas of the 'Hindus'; but when he ended, Hinduism had been croated"। একটি চার সহস্রাধিক সময়ের ও পুরোনো হিন্দুধর্ম কি সত্যিই সেদিন তৈরি হলো— না তো। নিবেদিতা বলতে চেয়েছিলেন যে, হিন্দুধর্ম এক নতুন রূপ লাভ করেছে। বেদ ও সাধনার ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান হিন্দু ধর্মকে বিশ্বমঞ্চে এক অন্য মাত্রার পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন ভারত থেকে উপস্থিত হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, ''তুমি হয়তো দ্বৈতবাদী, আমি হয়তো অদ্বৈতবাদী; তোমার হয়তো বিশ্বাস তুমি ভগবানের নিত্য দাস। আবার আর একজন হয়তো বলিতে পারে সে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। কিন্তু উভয়েই খাঁটি হিন্দু। ইহা কীরূপে সম্ভব হয়? সেই মহাবাক্য পাঠ কর। তাহা হইলেই বুঝিবে ইহা কিরূপে সম্ভব— 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতামালার অন্যতম বড়ো প্রভাব হলো— সনাতন হিন্দুধর্মই সকল ধর্মের প্রসূতিরূপে প্রমাণিত হওয়া। তিনি এও প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন যে, বেদান্তের মূল সূত্রগুলি কেবলমাত্র মুক্তি লাভের জন্যই সহায়তা করে না, পরন্তু সেগুলি ব্যবহারিক দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে কতখানি উপযোগী ও সহায়ক— তাও ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে খুব উল্লেখযোগ্য হলো, তৎকালীন পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও মনীষীগণ হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে পুনরায় বিচার করার অনুপ্রেরণাও পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের দৃপ্ত ও গভীর মননশীল বক্তব্যের মাধ্যমে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক উইলিয়াম জেমস্ প্রাথমিকভাবে বৈদান্তিক তত্ত্বের ব্যাপারে কিছুটা সন্দিহান্ হলেও স্বামীজীর প্রখর প্রজ্ঞা ও চিন্তাভাবনার দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আবার আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড, যাকে 'প্রসেস থট' নামক দর্শনের জনক বলা হয়, তিনিও এই উক্ত উইলিয়াম জেমস-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ভক্তিযোগের দিক দিয়ে দেখলে নিখুঁতভাবে বোঝা যায় যে বিশ্বমননে স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট প্রভাব হলো, ইষ্টদেবতা বা পছন্দের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার ধারণা প্রদান। তাঁর ওইরূপ চিন্তা থেকে যে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা আসে সেটাই হলো বেদান্তের নিষ্কর্ষ। কী অসাধারণ সেই ভাব যা প্রশ্নাতীতভাবেই অতুলনীয়। ঈশ্বরকে যার যে রূপে ভালো লাগে এবং যাঁর কিনা অভিব্যক্তি পৃথিবীর কোনো ধর্ম বা দর্শনে স্থান পেয়েছে, সেই রূপেই তাকে শ্রদ্ধা জানানো যেতে পারে এবং সেইটিই আমাদের চিরন্তন সত্যের পথে নিয়ে যাবে। স্বামীজী স্বকণ্ঠে বলছেন, ''আমরা সার্বিক সহনশীলতায় বিশ্বাস করি।" ঠিক তার পরেই আবারও বলছেন, ''এটা নিছক ভদ্রতার আড়ালে অন্যের প্রতি ঘৃণা লুকানো নয়, এ হলো সত্যিকারের গ্রহণ করে নেওয়া"। এভাবেই হিন্দু ধর্মের নিহিত সর্বজনীন রূপটিকে জগতের সামনে মেলে ধরে প্রকৃতপক্ষেই এক অন্য রূপ দান করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মানব মননে আশার আলো জাগিয়ে তাঁর উচ্চারণ করা কথাগুলো দিয়েই শেষ করব—''তাদের সময় ঘনিয়ে এসেছে, আমি মনে-প্রাণে আশা করি যে, আজ সকালে এই মহাসম্মেলনের সম্মানার্থে যে ঘণ্টা ধ্বনিত হয়েছে সেটা যেন মৃত্যুঘণ্টা হয় সবরকম ধর্মান্ধতার, সকলরকম অত্যাচারের, সে তলোয়ারের হোক বা কলমের।" ■

‘নোবেল পুরস্কার’ না পেয়েও নোবেল প্রাপক হিসেবে প্রচার কেন?

বরুণ মণ্ডল

অতি সম্প্রতি সুইডিশ নোবেল কমিটি নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তাতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কৃত হয়েছেন। দেশজুড়ে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই ঘোষণা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। একদল মানুষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পুরস্কারপ্রাপ্তির আনন্দে উল্লসিত। অন্যদিকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধা বাঙ্গালি আধা বিদেশি বলে সমালোচিত করেছেন। যার ফলে বন্দ্যোপাধ্যায়বাবুর এই পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে বাদানুবাদের তুমুল ঝড় উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। জিয়াগঞ্জে নৃশংসভাবে খুন হয়ে যাওয়া শিক্ষক পরিবারের ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের নীরবতা প্রসঙ্গে আলোচনার রাজনীতি মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আপাতত ছাপিয়ে গেছে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে আলোচনা এবং বাদানুবাদ। সেই প্রসঙ্গেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

এর আগেও বাঙ্গালি হিসেবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। বিদেশি বংশোদ্ভূত হলেও ভারতীয় নাগরিকত্ব নেওয়া মাদার টেরিজা শান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। যদিও এযাবৎ ন’জন ভারতীয় নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন কিন্তু আজকের আলোচনা বাঙ্গালি নোবেল প্রাপকদের নিয়ে। কেননা সাম্প্রতিক নোবেল কমিটির ঘোষণাতে আর যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের নিয়ে কোনো আলোচনা এই মুহূর্তে রাজ্যে হচ্ছে না। রাজ্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে অতিরঞ্জিত নাচানাচি হচ্ছে। ঠিক যেমন অমর্ত্য সেনকে নিয়ে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অমর্ত্য সেন এবং এই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই বামপন্থী মানসিকতার ব্যক্তি। অন্যদিকে এঁরা দুজনেই ছাত্র শিক্ষকের বন্ধনে আবদ্ধ। যদিও ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ভোটের নিরিখে বামপন্থা ০.৭ শতাংশের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে। অথচ সোশ্যাল মিডিয়া এবং আলোচনার স্থানে তাদের অবস্থান চেখে পড়ার মতো। কারণ ভ্রান্ত নীতির ফলে জনগণ তাদের পক্ষ ত্যাগ করেছে, সুবিধাবাদী এবং বামপন্থার ক্ষীর খাওয়া ব্যক্তিরা এখনো আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যাতে পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনের পুনরাবৃত্তি হয়। সেই অলীক স্বপ্ন নিয়ে মানুষের মনের মধ্যে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বামপন্থা মানেই উচ্চশিক্ষিতের আনাগোনা। এই অসৎ উদ্দেশ্যই বামপন্থী মানসিকতার অমর্ত্য সেন মাঝেমাঝেই ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আলটপকা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মন্তব্য করে বসেন। উপযুক্ত শিষ্য হিসেবে এবং

বামপন্থার শেষ সলতে হিসেবে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বর্তমান ভারতীয় অর্থনীতির সমালোচনা শুরু করে দিয়েছেন। তিনি আজ হয়তো অর্থনীতিবিদ হিসেবে প্রচারের আলোকে এসেছেন, পূর্বেও তো তাঁর অর্থনৈতিক জ্ঞান ছিল। কংগ্রেস জমানার ধুঁকতে থাকা ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে তার কিন্তু কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অপপ্রচার এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিতর্ক সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বামপন্থীরা চিরকালই ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তার উদাহরণ অপ্রতুল নয়। আজ এই নিবন্ধে শুধুমাত্র সাম্প্রতিক নোবেল পুরস্কার বিষয়ে তাদের অপপ্রচারের বিষয়টি তুলে ধরছি। কী ছিল নোবেল পুরস্কার সৃষ্টির প্রেক্ষাপট? বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল ডাইনামাইট, নাইট্রোগ্লিসারিন-সহ অসংখ্য বিস্ফোরক আবিষ্কার করে স্বত্ব হিসেবে প্রচুর টাকার মালিক হন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত।

ফ্রান্সের এক পত্রিকা তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর ভুল করে ভাবলো আলফ্রেড নোবেল মারা গেছেন। তাই খবরে লেখা হলো ''মানুষের মৃত্যুর সওদাগর নিজেই মারা গেলেন''। আলফ্রেড খবরটা পেয়ে মোটেই রাগলেন না। বরং শঙ্কিত হলেন পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে মৃত্যুদূত হিসাবে জানবে এই ভেবে। অথচ তাঁর আবিষ্কার ছিল মানুষের মঙ্গলের জন্য। যার অপব্যবহার হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর অর্জিত টাকা তিনি ব্যাঙ্ক অব সুইডেনে জমা করবেন। তাই হলো। প্রতিবছর সেই টাকার সুদ থেকে অর্জিত সম্পদ থেকে পাঁচটি বিষয়ে কৃতিত্বের জন্য পুরস্কার প্রাপকরা পেয়ে থাকেন ৮০ লক্ষ ক্রোনা, একটি নোবেলের অবয়ব অঙ্কিত স্বর্ণ পদক, একটি সনদ। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই সব ইচ্ছের কথা তিনি উইল করে গেছেন। সেখানে তিনি অর্থনীতিতে পুরস্কার দেওয়ার কথা বলেননি।

তাই আইনত অর্থনীতিতে কাউকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া যায় না। কাউকে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ বলাও যায় না। কিন্তু সুইডিশ ব্যাঙ্ক তাদের তহবিল থেকে একটি পুরস্কারের চল শুরু করে ১৯৬৯ থেকে। পুরস্কারদাতা রয়েল সুইডিস্ সাইন্সেস অ্যাকাডেমি। পুরস্কারের অর্থমূল্য এক হলেও পদকের চেহারা ভিন্ন। অথচ মিডিয়ার মিথ্যা প্রচারে বিশ্ববাসী জেনেছে, অর্থনীতিতে প্রথম বাঙ্গালি নোবেল বিজেতা অমর্ত্য সেন। এবছর আবার প্রচার চলছে অর্থনীতিতে নোবেল বিজেতা হিসেবে ঘোষিত হয়েছেন আর এক বাঙ্গালি অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি।

বিশিষ্ট নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ড. সুবোধ রায়ের বক্তব্য, অমর্ত্য সেনের নাম নোবেল বিজয়ী হিসেবে প্রচারিত হবার পর তিনি দুটি চিঠি লিখে জানতে চান এই অপপ্রচার কেন? একটি চিঠি লেখেন তিনি পুরস্কারদাতা ব্যাঙ্ক অব সুইডেন কর্তৃপক্ষকে। অন্যটি স্বয়ং অমর্ত্য সেনকে। অমর্ত্য সেন চিঠির জবাব দেননি। কিন্তু ব্যাঙ্ক অব সুইডেন তাদের চিঠিতে স্বীকার করেছেন, অর্থনীতির পুরস্কারটি নোবেল পুরস্কার নয়। ওটি এক ধরনের স্মারক পুরস্কার। যার পোশাকি নাম 'রিক্সব্যাঙ্ক অব সুইডেন প্রাইজ ইন ইকোনোমি সাইন্সেস ইন মেমোরি অব আলফ্রেড নোবেল'। এই পুরস্কারটাই অমর্ত্য সেন এবং সাম্প্রতিক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়েছেন। অথচ বাঙ্গালিকে গবেট বানানোর জন্য একদল ব্যক্তি এবং মিডিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার করে চলেছে যে এঁরা অর্থনীতিতে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। যা ডাঁহা মিথ্যা।

প্রবন্ধ পাঠান্তে বামপন্থীরা রে রে করে তেড়ে আসতে পারেন। তারা বলতে পারেন সমালোচকরা এমন একটা পুরস্কার পেয়ে দেখাক। তাঁর গবেষণাপত্র নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ আমরা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ নই। প্রশ্ন হলো, নোবেল না পেয়েও কেন নোবেল পাওয়ার মর্যাদা পাবেন? তাছাড়া যারা নিজেদের মেধা দেশের উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার না করে ব্যক্তিগত উন্নয়নের কারণে বিদেশে পড়ে থাকেন; এমনকী দেশীয় বিবাহিত স্ত্রীকে বর্জন করে ক্যারিয়ারের স্বার্থে বিদেশি নারীর পাণিগ্রহণ করেন তারা কেন এদেশের আপামর জনতার আইকন হবেন? আর যারা অমর্ত্য সেন এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিকে এদেশে আইকন বানানোর চেষ্টা করছেন তাদের অন্তিম মতলবটা কী! অবর্ণনীয় ও অতুলনীয় মেধা থাকা সত্ত্বেও দেশের জনগণের কাজে লাগার উদ্দেশ্যে যে এপিজে আব্দুল কালাম স্যার স্বদেশ ত্যাগ না করে, ব্যক্তিগত ক্যারিয়ারের দিকে না তাকিয়ে অতি সাধারণ জীবন যাপন করে দেশের সেবা করে গেছেন তাঁকেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদ থেকে সরিয়ে অমর্ত্য সেনকে বসানো হয়েছিল। যিনি বিদেশে বসবাস করেই বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে গেছেন। বিভিন্ন পদে পদাধিকার বলে আপনজনদের বসিয়েছেন। এদিকে অতি সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ইশতাহারে 'ন্যায় প্রকল্প' নামে গরিব মহিলাদের অ্যাকাউন্টে বছরে ৭২ হাজার টাকা করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দানখয়রাতের এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থের জোগান হিসেবে উচ্চ কর আরোপের নিদান দিয়েছিলেন। জগদ্বিখ্যাত (!) এই অর্থনীতিবিদের সেই প্রকল্পকে যদিও দেশের মানুষ নস্যাৎ করে দিয়েছেন। আসলে কংগ্রেস এবং বামপন্থী নেতাদের দ্বিচারিতা ভারতীয় জনতা বুঝে গেছেন। তাই অপাংক্তেয় হয়ে পড়ায় আপাত রাজনীতি নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে 'আইকন' বানিয়ে তাদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের 'ব্রেনওয়াশ' করার অপচেষ্টার অন্যতম মাধ্যম হলো নোবেল পুরস্কার না পেয়েও নোবেল পুরস্কার প্রাপক হিসেবে প্রচার করা। তবে আশার কথা এই যে, মানুষ যখন ন্যায় প্রকল্পের মতো লোভনীয় ফাঁদে পা দেয়নি তখন অধুনা রাজনৈতিক সচেতন ভারতীয় জনতা কংগ্রেস এবং বামপন্থীদের এই অপচেষ্টাকে অবশ্যই রুখে দেবে। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

একাদশ আণবিক শক্তি সম্মেলন উদ্বোধন ড. জিতেন্দ্র সিংহের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় আণবিক শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিংহ বলেছেন, হোমি ভাবার পরিকল্পনার রূপায়ণে ভারত সক্ষম হয়েছে। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশে ভারতের পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহারের কথা বলেছিলেন তিনি। হোমি ভাবার পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে আণবিক শক্তির প্রয়োগে বৈচিত্র্যকরণ ঘটিয়েছে। ড. সিংহ সম্প্রতি একাদশ আণবিক শক্তি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

তিনি বলেন, দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারে সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আণবিক শক্তি ও মহাকাশ দপ্তরের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগে দক্ষিণ ভারতেই আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, এখন হরিয়ানার গোরখপুরে পারমাণবিক উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ চলছে। আণবিক শক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তুলতে নতুন দিল্লির প্রগতি ময়দানে 'হল অব নিউক্লিয়ার এনার্জি' স্থাপন করা হয়েছে। মহাকাশ দপ্তরের জন্য একই ধরনের একটি হল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুদক্ষ নেতৃত্বে বিগত পাঁচ বছরে পারমাণবিক ক্ষেত্রে একাধিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে জানিয়ে ড. সিংহ আণবিক শক্তি ক্ষেত্রে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলা এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। তিনি চিকিৎসা, বিশেষ করে ক্যান্সারের চিকিৎসায় আণবিক শক্তি ব্যবহারের কথা বলেন। ক্যান্সারের চিকিৎসার খরচ নগদ বিহীন করে তুলতে সরকার মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার ফর ক্যান্সার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার প্রসঙ্গে জনমানসে যে অবান্তর ধারণা রয়েছে, তা দূর করার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তিনি জোর দেন। আণবিক শক্তিকে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি চাহিদা মেটানোর উৎস হিসেবে বর্ণনা করে ড. সিংহ বলেন, আণবিক শক্তি দৈনন্দিন জীবনযাপনের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। অনুষ্ঠানে আণবিক শক্তি দপ্তরের সচিব তথা আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কে এন ব্যাস, কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ড. অনিল কাকোদকর, কমিশনের সদস্য ড. আর বি গ্রোভার, হোমি ভাবা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের চ্যান্সেলর ড. সুকুমার ব্যানার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে তিনটি টেকনিক্যাল সেশনের আয়োজন করা হয়। বক্তারা শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদক শিল্পের সামনে সুযোগ-সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পৌর বর্জ্য পরিচালনা ক্ষেত্রে আণবিক শক্তির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ড. সীতানাথ গোস্বামী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিদ্বৎসম্মানে ভূষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৯ সালের পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিদ্বৎ সম্মানে ভূষিত করলেন কলকাতার প্রবীণ স্বয়ংসেবক মহামহোপাধ্যায় ড. সীতানাথ গোস্বামী বাচস্পতিকে। এই সম্মানের জন্যে সমগ্র ভারত থেকে বিদ্বজ্জন হিসেবে তিনিই একমাত্র নির্বাচিত হয়েছেন। বাঙ্গালি হিসেবে এ আমাদের গর্বের খবর। এই সম্মানের আর্থিক মূল্য একান্ন হাজার টাকা।

এবারের এই সম্মান প্রাপক ড. সীতানাথ গোস্বামী তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, ভারতীয় সংস্কৃতি বেদ-বেদান্ত উপনিষদের বাংলা গ্রন্থ রচনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, তাঁর অসামান্য খ্যাতির জন্য তিনি পণ্ডিত সমাজ এবং দুটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি অর্জন করেন। যোগীন্দ্রনাথ বাগচীর কৃতী ছাত্র সীতানাথ গোস্বামী একজন আলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী। ১৯২৯ সালে নবদ্বীপের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সহধর্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতা যাদবাচার্যের একাদশ বংশজ তিনি। ১৯৫১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ সংস্কৃততে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদক পান। ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

এই প্রতিষ্ঠানে তিনি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দশ বছর কর্মরত ছিলেন। তাঁর কাছে প্রায় চল্লিশ জন ছাত্র-ছাত্রী গবেষণা করেছেন এবং ডি.লিট উপাধি পেয়েছেন। ১৫ আগস্ট ২০০১ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'অরবিন্দ পুরস্কার' এবং 'বাচস্পতি' উপাধি লাভ করেছেন। ভারতীয় বিদ্যাভবন তাঁকে 'বেদরত্ন' উপাধি প্রদান করেছে।

এনসিসি সেনাবাহিনীগুলির মশাল-বাহক : শ্রীপাদ নায়েক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রীপাদ নায়েক জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (এনসিসি)-র ক্যাডেটদের প্রয়াসের প্রশংসা করে বলেছেন, এনসিসি হলো সেনাবাহিনীগুলির প্রকৃত মশাল-বাহক। সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড এনসিসির ক্যাডেটদের মধ্যে প্রোথিত রয়েছে। সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে এনসিসির ৫১তম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে শ্রী নায়েক একথা বলেন। এনসিসির গঠন ও প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই কমিটি সরকারকে সুপারিশ করে থাকে।

বিভিন্ন সামাজিক কাজে এনসিসি ক্যাডেটদের প্রয়াসের প্রশংসা করে শ্রী নায়েক বহুত্ববাদ, জাতীয় সংহতি, নিঃস্বার্থ সেবা এবং যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধের মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ক্যাডেটদের প্রশংসা করেন। শ্রী নায়েক আরও বলেন, ওড়িশা, বিহার, কেরল এবং কর্ণাটকের সাম্প্রতিক বন্যায় এনসিসির ক্যাডেটরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ভারত ও কাজাখাস্তান-সহ অন্যান্য মৈত্রীভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গে যুব-বিনিময় কর্মসূচির জন্য স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের ফলে গ্রামীণ ও আধা-শহর এলাকার যুবরাও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। এনসিসির ক্যাডেট সংখ্যা বর্তমানের ১৪ লক্ষ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষে পৌঁছবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বালিকাদের আরও বেশি সংখ্যায় ক্যাডেট হিসেবে এনসিসি-তে যোগদানে উৎসাহিত করার ওপরও শ্রী নায়েক জোর দেন।

সীমান্ত পরিকাঠামো জোরদার করতে সরকার বদ্ধপরিকর : রাজনাথ সিংহ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশের সুরক্ষা ও শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে সীমান্ত পরিকাঠামো জোরদার করতে সরকার বদ্ধপরিকর, বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। তিনি লাদাখে কূটনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ 'কর্নেল চেওয়াং রিনচেন সেতু'র উদ্বোধন করেন। এই সেতুটি নির্মাণ করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও)। পূর্ব লাদাখের শিয়ক নদীর ওপর নির্মিত এই সেতুটি দুরবুক এবং দৌত বেগ ওল্ডির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবে।

অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে সরকার সীমান্ত সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, সীমান্ত এলাকার উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। ভারত ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখতে সরকার উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি মামাল্লাপুরমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং-এর বৈঠকের সময় জিনপিং কাশ্মীরের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। এমনকী, সন্ত্রাস দমনে চীন দৃঢ় পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেও জানিয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। এতে সেখানকার মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। উন্নয়নের নতুন দরজা খুলে যাবে। লাদাখ খুব শীঘ্রই বিনিয়োগকারীদের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠবে বলেও তিনি জানান। এতে সেখানকার আয় যেমন বাড়বে, স্থানীয় মানুষের অনেক কর্মসংস্থানও হবে। ৩৭০ ধারা বাতিল করার উদ্দেশ্যই হলো সন্ত্রাস দমন এবং স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে তা রোধ করা। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্তে নেওয়ার ফলে সেখানকার মানুষের মানবাধিকার সুরক্ষিত হবে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে। শ্রী সিংহ বলেন, সরকার সমস্যা সমাধানে এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে তারই প্রতীক হলো 'কর্নেল চেওয়াং রিনচেন সেতু'। এই সেতু দুরবুক এবং দৌলত বেগ ওল্ডির মধ্যে শুধু যোগাযোগই রক্ষা করবে না, লাদাখ ও জম্মু-কাশ্মীরের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলবে। এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে এবার ওই দুই জায়গার মানুষই দেশের উন্নয়নে সরাসরি শামিল হতে পারবেন। এই সেতু নির্মাণে বিআরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বিআরও ১,২০০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছে। তিনি বলেন, খুব শীঘ্রই লাদাখ বিদেশি পর্যটকদের গন্তব্যস্থল হয়ে উঠবে। অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কর্নেল চেওয়াং রিনচেনের নাতনি ড. ফুঙসোগ আঙমো-কে সংবর্ধনা জানান। সেনা প্রধান জেনারেল বিপীন রাওয়াত, নর্দার্ন কম্যান্ডের জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল রনবীর সিংহ, বিআরও-র ডিজি লেফটেন্যান্ট জেনারেল হরপল সিংহ, লাদাখ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জামিয়াং শেরিং নামগিয়াল-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানের একটি অধ্যয়ন

ড. সুকান্ত সরকার

লোকসংস্কৃতি কেবল সমাজের দর্পণ নয়, তাতে যে জৈববৈচিত্র্যও প্রতিফলিত হয় তা সুন্দরভাবে চর্চিত হয়েছে ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলার জৈববৈচিত্র্য ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে। আধুনিককালে ফোকলোর বা লোকসংস্কৃতি চর্চা কেবল ফোকলোরের বিবরণে আবদ্ধ নয় তা আন্তর্বিদ্যা শৃঙ্খলের জালে আবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন Method-এর মাধ্যমে চর্চিত হচ্ছে। ফোকলোরের বিবরণের চর্চাই হলো 'Folkloristics' যাকে ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস বলেছেন 'লোকসংস্কৃতি বিদ্যা' (২০০৬), ড. মজহারুল ইসলাম বলেছেন 'ফোকলোর বিজ্ঞান' (১৯৬৭), ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় যাকে বলেছেন 'লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞান' (১৯৮৫)। 'Folkloristics'-এর নানারকম পদ্ধতি রয়েছে যেমন---জাতীয়তাবাদী, মার্কসবাদী, তুলনামূলক, সৌরতত্ত্ব ইত্যাদি। প্রস্তুত গ্রন্থে জৈববৈচিত্র্যের Text-কে লোক পরিবেশে Contextual method-এর মাধ্যমে চর্চা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে টেক্সট অপেক্ষা কন্‌টেক্সট-এর প্রাধান্য। কন্‌টেক্সট বা প্রসঙ্গের অর্থ উদ্ধার করতে পারলে তবেই লোকসংস্কৃতি উপাদানের প্রকৃত তাৎপর্যকে অনুধাবন করা সম্ভব। কনটেক্সট মেথড হলো মূলত লোকসমাজের নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা টিকাটিপ্পনি যা মেটাফোকলোর নামে পরিচিত। উদাহরণ হিসেবে গ্রন্থটির ছড়াগুলিতে লোকসমাজের নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা বাঙালি, তিনি outsider নন। তাই তাঁর দৃষ্টিকোণ Etic নয় Emic। তাঁর Emic দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বাংলার জৈববৈচিত্র্যের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। এই দৃষ্টিতেই তিনি কৃষিজলবায়ু ভিত্তিক ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য Participatory Rural Appraisal পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। জৈববৈচিত্র্যের সামগ্রিকরূপ বাঙ্গলার লোকায়ত জীবনের প্রতি পদে অকৃত্রিমভাবে প্রভাব ফেলেছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

গ্রন্থটিতে ১৪টি অধ্যায় তার মধ্যে প্রথম ৭টিতে ধাঁধায়, ছড়ায়, খনার বচনে, লোককথায় গীতিকায়, মঙ্গলকাব্যে, আলপনায় জৈববৈচিত্র্য অনুসন্ধান করেছেন। পরবর্তী ৭টি অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ৪টিতে উদ্ভিদ জগতের মূলত ধান, পান, তুলসী ও সুন্দরবনের ফার্ন জৈববৈচিত্র্যের লোকসংস্কৃতিকে প্রভাব নিয়ে চর্চা হয়েছে এবং শেষ তিনটিতে কাক সংস্কৃতি, সর্পসংস্কৃতি ও

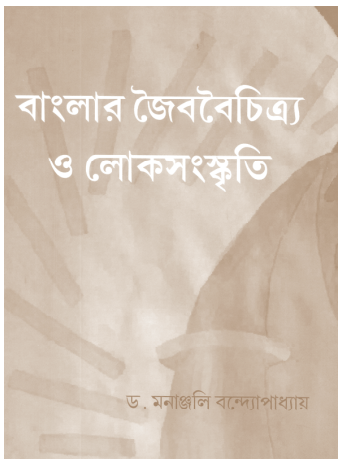

দেবদেবীদের বাহন সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করা হয়েছে।

লেখিকা গ্রন্থটিতে বাঙ্গলার লোক সংস্কৃতিতে জৈববৈচিত্র্যকে তুলে ধরতে গিয়ে 'Folkloristics'-এর বিভিন্ন দিক বা মাত্রাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন মনস্তাত্ত্বিক, মোটিফ ইনডেক্স, সাদৃশ্যমূলক জাদু বা অনুকরণাত্মক জাদু, টোটেম ও সর্বোপরি জাতীয়তাবাদী চিন্তা চেতনা।

মনস্তাত্ত্বিক দিক বিড়ালের একটি ছড়ায় দেখতে পাই—

''মোড়লদের তিনটি বউ বাড়া ভাত খায়/এপাত খায়, ওপাত খায় বিড়ালে দোষায়।"

'Folkloristics' বিষয়ে যে molif ও index ব্যবহার করা হয় তা আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন লোককথায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'সাতভাই চম্পা' গল্পে মানুষের ফুলে রূপান্তর হলো Molif transformation : Man to flower : D 212, ফুলেদের কথা বলা; molif : transformation : flower to persia : D 431.1, এই ধরনের প্রচুর Motif-index গ্রন্থটিতে উল্লেখিত আছে।

আলপনায় জৈববৈচিত্র্য আলোচনা করতে গিয়ে সাদৃশ্যমূলক জাদু বা অনুকরণমূলক জাদু লক্ষ্য করা যায়। সাদৃশ্যমূলক জাদুতে সমধর্মী বিষয় সমধর্মী বিষয়েরই জন্ম দেয়। 'হাতে পো কাঁখে পো' বা 'সার্পিল লতা' আলপনা সন্তান কামনাত্মক। পদ্মফুল, প্রজাপতি, ভ্রমরের আলপনাগুলি বিবাহকেন্দ্রিক আলপনা। গ্রন্থটিতে আলপনাকে জাদুবিশ্বাস ও নান্দনিকতার মিলিত ফসল হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। আলপনা এখানে visual folklore যেখানে জৈববৈচিত্র ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থটিতে কেবল ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনি ইত্যাদির মাধ্যমে জৈববৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে শুধু নয়, এখানে পান, তুলসী, ধান, কাক, সাপ, বিভিন্ন দেবদেবীর বাহন প্রভৃতি কীভাবে বাংলা লোকসংস্কৃতির Totem-এ পরিণত হয়েছে তা সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই টোটেমগুলি আবার বিভিন্ন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। যেমন সর্পসংস্কৃতি বা Serpent lore, কাকসংস্কৃতি, ধান্যসংস্কৃতি, তুলসী সংস্কৃতি ইত্যাদি।

সর্বোপরি বাঙ্গলার লোকসাহিত্যে যে বস্তুবীজ পর্যাপ্ত মাত্রায় নিহিত আছে তা হলো প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের অনবদ্য পাঠ। আলোচ্য গ্রন্থে পশুপাখি, জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, জল, মাটি, চন্দ্র, সূর্য সকলকে বাঙ্গলা লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যা জৈববৈচিত্র্যে বিশ্লেষণের ভিন্নমাত্রা প্রদান করেছে। বাঙ্গলা লোকসংস্কৃতির এই উপাদানগুলি বাঙ্গালি জাতির সমবেত আবেগকে সংবদ্ধ করেছে। গ্রন্থে উল্লেখিত অজৈবগত সংস্কৃতি যেমন লোকসাহিত্য (লোক ছড়া, লোকধাঁধা, লোককাহিনি, লোকপ্রবাদ), জাদুবিশ্বাস, কৃৎকৌশল, বিশ্বাস -সংস্কার ইত্যাদি এবং জৈবসংস্কৃতি যেমন ধান, পান, তুলসী, সাপ, কাক, দেবদেবীর বাহন ইত্যাদি বাঙ্গালির জাতিসত্তাকে তুলে ধরেছে যা জাতির ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছে। বাঙ্গালি জাতির স্বপ্ন, আবেগে, জাতিত্ববোধ তথা জাতীয়তাবোধ গ্রন্থটিতে পরতে পরতে লেখিকার স্বকীয় দৃষ্টি (Emic view)-র মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

বাংলার জৈববৈচিত্র্য ও লোকসংস্কৃতি।
লেখক : ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রকাশক : কবিতিকা। মূল্য : ২৫০ টাকা।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

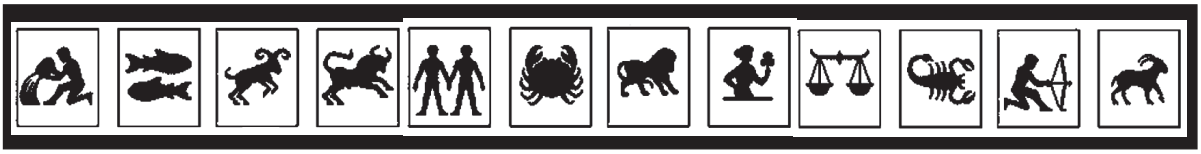

২৮ অক্টোবর (সোমবার) থেকে ৩ নভেম্ববর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, কন্যায় মঙ্গল, তুলায় রবি-শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে শনি, কেতু। ২৯-১০ মঙ্গলবার, রাত্রি ১টা ১০ মিনিটে শুক্রের পুনরায় বৃশ্চিকে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মিথুনে পুর্নবসু নক্ষত্র থেকে কন্যায় হস্তা নক্ষত্রে।

মেষ : অপ্রত্যাশিত ব্যয়, যুবক-যুবতীদের নতুন বন্ধুত্ব। সম্পত্তি বিষয়ক ব্যস্ততা, কর্মের যোগসূত্রে দূর গমন, বাড়ি-গাড়ি, বাসনা তৃপ্তির যোগ। কর্মে সিদ্ধিলাভ হলেও প্রাপ্তির ভাণ্ডার আশাব্যঞ্জক নহে। পূজারি, মঠাধ্যক্ষ, জ্যোতিষী প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মান্যতা। চপলতা, জেদ পরিহারে মানসিক প্রশান্তি। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

বৃষ : গৃহের এলেমেলো পরিবেশ, সন্তানের আধুনিক মনস্কতা ও মাতার স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ। শিল্পী-কলাকুশলীদের সৃষ্টির বৈচিত্র্য- সৌন্দর্যের উপাসনা। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যস্ততা ও স্বীকৃতি। শাস্ত্রীয় জ্ঞান আহরণে ইতিবাচক ফল ও হৃদয়ের বিকাশ। অগ্রজের পদোন্নতি, অসমাপ্ত কর্মে সমাধায় মানসিক চাপ।

মিথুন : কর্মস্থানে দায়িত্ববোধে সুনামের পরিবর্তে হতাশার প্লাবন। সন্তানের বহুমুখী কর্মপ্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীর পদোন্নতি ও আর্থিক সমৃদ্ধির সহায়ক। কর্মপ্রার্থীদের আসন্ন সিদ্ধি করায়ত্ত হয়েও অধরা থাকবে। সামাজিক প্রকল্পে সক্রিয়তায় জনপ্রিয়তা ও গুরুজন বিষয়ক উদ্বেগের অবসান।

কর্কট : কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তায় সহকর্মীদের দ্বারা সাফল্য। উজ্জ্বল ভাবমূর্তি কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি বিত্ত ও আভিজাত্য গৌরব। প্রেমের চাতক দৃষ্টি ও রমণীর কুহকে সময়ের অপচয়, মানসিক অবসাদ। অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় ও মানবিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গুরুজনের স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্বেগ।

সিংহ : নিকটজনের মন্দ ব্যবহার, কলহ-বিবাদে বিষণ্ণতা। সুযোগ সন্ধানী বকধার্মিক ও মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। গৃহে আত্মীয় সমাগম, বিশিষ্টদের সান্নিধ্য দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূরণ। রোজগারের নতুন দিশা।

কন্যা : শরীরের যত্নের প্রয়োজন, নিন্দার দাবানল মোচনার্থে সহকর্মীর সঙ্গে ঐক্যমত হওয়া শ্রেয়। জ্ঞানের সঞ্জীবনী সুধায় শুভকর্ম পথে সাফল্য। স্ত্রীর চপলতায় শান্ত-সংযতভাবে গৃহসুখ বজায় রাখুন। অচলায়তন ভেঙে বিদ্যা-ব্যবসা ও সমাজ ভাবনায় নতুন দিশা। অর্থ, বিত্ত, সম্মান, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা।

তুলা : কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ণ সৃষ্টির আনন্দ ও শংসা লাভ। লেখক, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, রিসার্চস্কলার, সাংবাদিকের প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণ সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও মান্যতা। কর্মপ্রার্থীদের সংস্থানের সার্থক প্রয়াস। সপ্তাহের প্রান্তভাগে বসন্ত সমাগমের ন্যায় রমণীর লুব্ধ দৃষ্টিতে অস্থির চিত্ত। কীট-সরীসৃপ, নিম্নাঙ্গের পীড়ায় সতর্ক থাকা দরকার।

বৃশ্চিক : পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যস্ততা ও গুরুজনের অসুস্থতা, সঠিক পরিচর্যায় বিলম্ব। মানসিক অস্থিরতা সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তায় সাফল্য ও সিদ্ধি লাভ। জ্ঞানী-গুণীজনের মান্যতা, গবেষকদের শংসা ও স্বীকৃতি। আর্থিক লেনদেন ও লিখিত চুক্তিতে সতর্ক থাকতে হবে। প্রেমানন্দে প্লাবিত মন তবে কলা-কুশলতায় সাফল্য।

ধনু : প্রতিবেশীর অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য, নিকটজনের মন্দ ব্যবহার, প্রশাসনিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। দৃঢ়তা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসার বৈভব, নিজ এলাকায় সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে গুণীজন সান্নিধ্য, আধিপত্য। সন্তান সম্ভাবনার শারীরিক ক্লেশ ও নেতিবাচক ফল।

মকর : পেশাদার জীবনে একাধিক শুভ যোগাযোগ ও নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ। নিজ উদ্ভাবনী শক্তি গৃহশ্রীর দূরদৃষ্টি ও সঠিক পদক্ষেপে আর্থিক গতি ত্বরান্বিত হবে। নিকট ভ্রমণ, অযাচিত হিতাকাঙ্ক্ষী থেকে সাবধানতা ও সর্দি, কাশি, সংক্রমণ জনিত চিকিৎসার প্রয়োজন।

কুম্ভ : ভ্রাতা-ভগ্নি ও সন্তানের জ্ঞান, পাণ্ডিত্য অর্জনে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ ও কর্মে কর্তৃপক্ষের শংসা ও স্বীকৃতি লাভ। কৌশলীমন রহস্যজনক কাজে প্রবণতা বৃদ্ধি। দূরের কোনো বন্ধুর সান্নিধ্যে জীবনে চলার নতুন দিশা। সপ্তাহের শেষভাগে সন্তানের অবিধিপূর্বক আচরণে মনঃক্লেশ। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা কঠিন।

মীন : উচ্চশিক্ষা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও কর্মে আলস্য, উদাসীনতায় প্রতিবন্ধকতা। পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও সন্তানের ভ্রান্ত পদক্ষেপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমঝোতা করতে হবে। শারীরিক অসুস্থতা, দোদুল্যমানতা, বয়স্ক মিত্র বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। বন্ধন-স্থানান্তর ও প্রশাসনিক রদবদলে পড়ার সম্ভাবনা।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য